কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

জুন—৮২

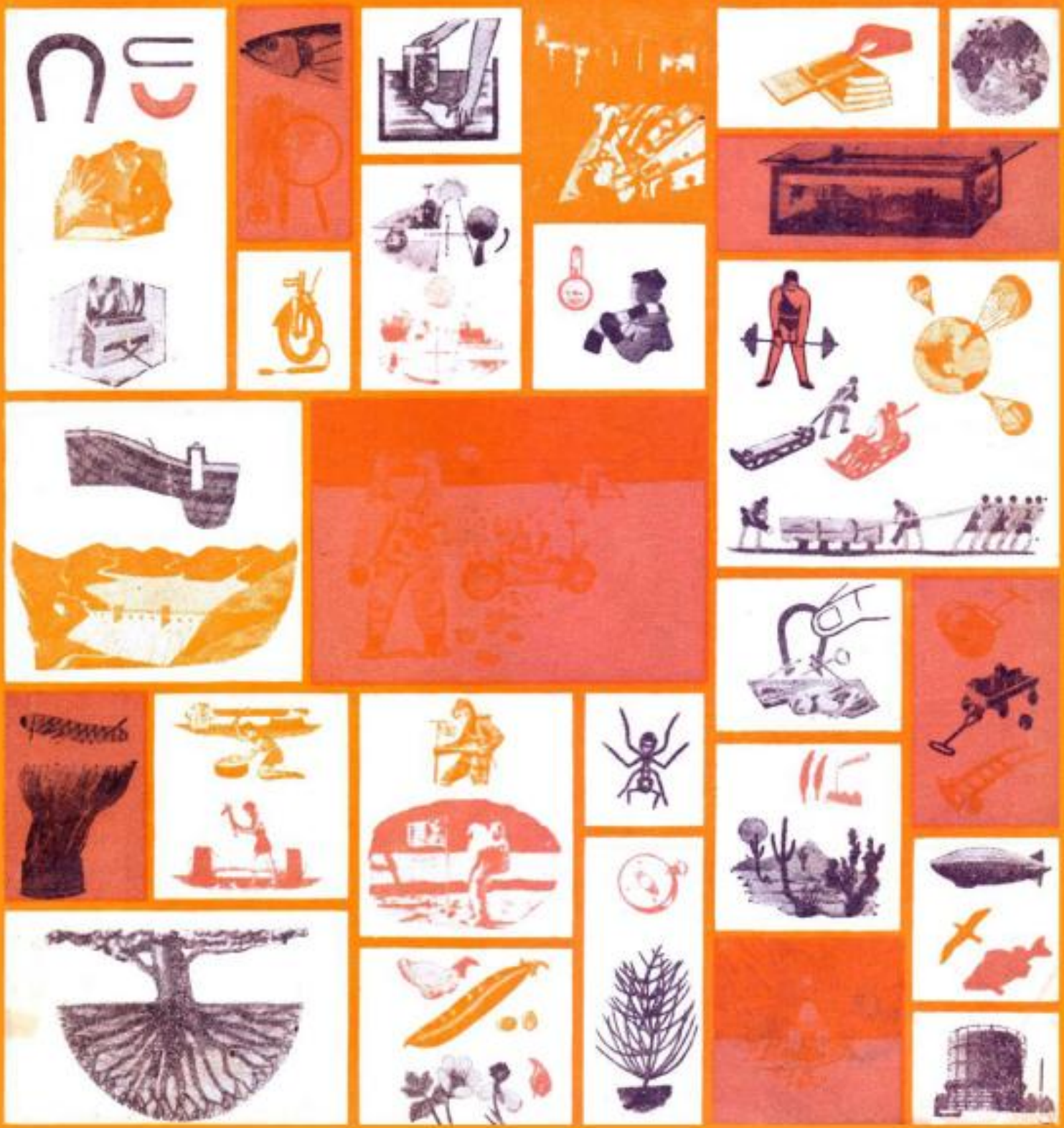

Hard Copy & Scan - Subhajit Kundu
Edit - Optimus Prime

This e-copy is scanned and preserved by
Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by
giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

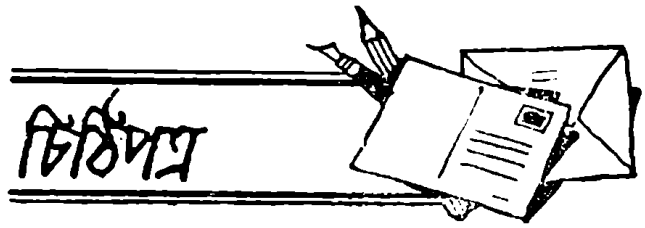

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,

আমি আপনার পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক। মার্চ, ১৯৮২-র প্রকাশিত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকায় বিদ্যুৎ মজুমদারের "বুদ্ধি দিয়া ব্যাখ্যা কর" রচনাটি ভাল লাগল। কারণ ঐ রচনার মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধির পরীক্ষা করা হয়েছে। তবে ২নং পয়েন্টের প্রথম লাইনে লেখা হয়েছে যে "একদিন এক বন্ধুর বাড়ি গিয়া দেখি সে একটি ফ্লাস্কে গরম জল ঢালছে।" পরে তৃতীয় লাইনে লেখা হয়েছে যে "জল যেখানে ১০০°C তে বাষ্পে পরিণত হয় সেখানে ১৪০°C তেও জল আদৌ ফোটেনি।' কিন্তু জল ঢালার সঙ্গে ফোটানোর কি সম্বন্ধ তা বোঝা গেল না। বিষয়টি একটু লেখক যদি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন তাহলে বাধিত হব। আশাকরি প্রশ্নটির সঠিক ব্যাখ্যা পাব।—বিশ্বজিৎ দত্ত

কাঁসারী পাড়া, পোঃ আঁফস—কালনা, বর্ধমান

সম্পাদক মহাশয়,

আমি অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী, এবং নিয়মিত কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পড়ি। মার্চের সংখ্যায় অঙ্কের ওপর ৬ঃ সিদ্ধার্থ রায়ের গুণ করার বৈদিক নিয়মটা শিখে অবাক হয়ে গেছি। এরকম লেখা আরো পড়তে চাই। আমার দুটি প্রশ্ন আছে ঃ-

১) যদি গুণ বা গুণক ১০-এর কোন ঘাতের কাছাকাছি না হয়, তবে কি এ নিয়ম খাটবে না?

২) নিয়মটির প্রমাণ আছে কি?

—অনিন্দিতা মিত্র ২৯৭, যোধপুর পার্ক, কলিকাতা—৬৮

মহাশয়,

আমি এপ্রিল' ৮২ সংখ্যায় সোমনাথ রায়ের 'পুতুল নিয়ে খেলা লেখাটি পড়িয়া খুবই আনন্দিত হলাম। তিনি শেষ যে অঙ্কটা দিয়েছেন সেটি তিনি Trial Method-এ কষতে নিষেধ করেছেন। আমি নিম্নে অঙ্কটি কষছি এ ব্যাপারে লেখকের মত কি জানতে চাই। মনে করি সংখ্যাটি $10x+y$

প্রশ্নানুসারে $x+y+8 \quad \therefore y=8-x$

$10+(8-x)-18=11$ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা

বা $9x-10=11$ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা

x-এর মান 6 হইলে

$(9x-10)$, 11 দ্বারা বিভাজ্য হয়।

অতএব $x=6$

$y=8-6=2$

$\therefore$ নির্ণেয় সংখ্যা $=10\times 6+2=62$

[* 11 দ্বারা বিভাজ্য হবার কারণ অন্তরফলের অঙ্কদ্বয় পরস্পর সমান]

—বিষ্ণুপদ কাণ্ডু বানপুর হাইস্কুল, নদীয়া

মহাশয়, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকা March, 1982 (দশম সংখ্যা) সংখ্যায় আপনার লিখিত আর্যভট্টের বর্গমূল বাহির করিবার যে সহজ পদ্ধতি দেখাইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ প্রীত হইলাম। কিন্তু ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া 82369-এর বর্গমূল (287) বাহির করিতে সমর্থ হইলাম না। দয়া করিয়া কারণ জানাইয়া উত্তর দিবেন। যদি ঐ নিয়মটি সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়, তবে উহা প্রচার করা যুক্তিযুক্ত মনে করি না।

—মিহির কুমার বিশ্বাস

10/B, হরিতকি বাগান লেন, কলিকাতা—৬

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান এপ্রিল—'৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীপ্রদীপ কুমার সরকারের চিঠির উত্তর

সাধারণত : পাঠ্য পুস্তকে X-অক্ষের নামকরণ XOX' আছে, এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মনে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। কারণ আমাদের লিখন পদ্ধতি বাঁদিক থেকে ডান দিক। মনে হয় এই কারণে বহু পরীক্ষার্থী লেখচিত্র অঙ্কনের সময় লেখপত্রে x-অক্ষের বাঁদিকে X অক্ষরটি লেখে কিন্তু ডানদিক OX'-কে ধনাত্মক ধরে। এই বিভ্রান্তি নিরসনের জন্যেই আমি আমার নিবন্ধে [লেখচিত্র অঙ্কনে সতর্ক হওয়া উচিত, কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান ফেব্রুয়ারী—'৮২ সংখ্যা] x-অক্ষরে নামকরণ X'OX (বাঁ দিক থেকে ডান দিকে) করেছি। x-অক্ষের নামকরণ XOX' করে কেউ যদি OX-কে ধনাত্মক ধরে, আপত্তির কি? বিষয়টির ব্যাখ্যা করার সুযোগ পেয়ে পত্রদাতাকে [শ্রীপ্রদীপ কুমার সরকার, ইটিও ইউনিয়ন হাইস্কুল, ২৪ পরগনা] অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ অসীম মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র কলেজ, কলিকাতা-২৯

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান

২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা ॥ জুন ॥ ১৯৮২
প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহ-সম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

আগামী ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। স্টকহলম শহরে অনুষ্ঠিত এক বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনে এই দিনটিকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য আমাদের চারপাশের পরিবেশকে সুন্দর রাখা, সুস্থ রাখা। একটি বিশেষ দিনকে চিহ্নিত করা হলেও—এর মানে এই নয় যে, শুধু সে দিনটিই পরিবেশ সুস্থ রাখা। আমাদের চারপাশের জলবায়ু ও পরিবেশ নানা কারণে দূষিত হয়ে আমাদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে। তাই ভবিষ্যতের কথা ভেবে—এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সচেতন হওয়া দরকার। এবং তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠক, তোমাদের কাছে আশা করব, তোমরা সব সময়েই নিজের পরিবেশকে যতদূর সম্ভব পরিষ্কার পরিছন্ন রাখবে।

॥ সূচীপত্র ॥

চিঠিপত্র : ১
সম্পাদকীয় : ২

দপ্তর থেকে
মহাকাশে পঁচিশ বছর : সমরজিৎ কর ৩

উপন্যাস
অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড : ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ৪৫

গল্প
সুপার পাওয়ার ইনজেকশন : নারায়ণ চক্রবর্তী ২১

পড়াশোনা
রসায়নের সহজপাঠ : অমরনাথ রায় ৯
গোলীয়তলে আলোকের প্রতিফলন : অলক চক্রবর্তী ৪১
জীবনবিজ্ঞানের প্রথমপাঠ : তারকমোহন দাশ ১০
বৈদিক যুগের সহজ গণিত : সিদ্ধার্থ রায় ৩২

পশুপাখীর পরিচয়
বসন্ত বউরি পাখিদের কথা : অজয় হোম ১৮
তিনটি অদ্ভুত জীব : বৃন্দাবনচন্দ্র বাগচী ৭

ছবিতে গল্প
জুলে ভার্নের টোয়েন্টী থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী
গৌতম কর্মকার : দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রচ্ছদ
বিজ্ঞানসাধক জগদীশচন্দ্র : দিলীপ দাস ১৭
খুদে বৈজ্ঞানিক : দিলীপ দাস ১৫
ছবির মজা : প্রণব হোড় ৪৪
হাবুলের বিজ্ঞানভাবনা : ধীরেন বল ৫৬

বিবিধ
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণ সভা : ১৬
সংবাদ ৪০
কোলাঘাট সায়েন্স হবি সেন্টার : দেবাশিষ রায় ২০

জীবন চরিত
বরাহমিহির : নন্দলাল মাইতি ৩০
কম্পিবিজ্ঞানের প্রবাদপুরুষ জুলে ভার্নে : সুনীত রায় ৩৯

জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা
ক্যালেণ্ডারের মজা : চন্দন দেব ৭
সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ : বিমান বসু ২৭
যে সাপেরা সাপ খায় : বিকাশকান্তি সাহা ৩১
ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের পরিচয় : স্বপনবুড়ো ৩৩
সাইক্লোন ! সাইক্লোন !! প্রসাদ সেন ৩৪
পোকাখেকো গাছ : তৃপ্তি রায় ৩৬
ভাবনা : অনির্বাণ চক্রবর্তী ৮

বিজ্ঞানের বিচিত্রা
টি. ভি. তে যা দেখা যায় না : অনীশ দেব ৩৭

ছোটদের দপ্তর
বিজ্ঞানজিজ্ঞাসার উত্তর দাতাদের নাম : ৪৯
প্রশ্নোত্তর ৫০ ॥ বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা ৫০
গদাইয়ের জীবনবিজ্ঞান : বরুণদেব ব্যানার্জী ৫১
ভেবে ভেবে বল : শুভব্রত রায়চৌধুরী ৫২
লেসার রহস্য : কৌশিক লাহিড়ী ৫৩
নিজে কর মজার পুতুল : রাজীব মুখোপাধ্যায় ৫৩
বৈদ্যুতিক পিয়ানো গঠন : রাজেশ চ্যাটার্জী ৫৪
মশক-নিধন যজ্ঞ : অনিল কর্মকার ৫৫

প্রচ্ছদ : অভয় মিদ্যা ॥ অন্যান্য ছবি : সঞ্জয় ভট্টাচার্য

দপ্তর থেকে

মহাকাশে পঁচিশ বছর

সমরজিৎ কর

পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। অভিযান সফলের পর সংবাদপত্রের উচ্ছ্বাস ও অভিনন্দন।

বিপ্ বিপ্—বিপ্—বিপ্ বিপ্ বিপ্……

ইংলণ্ডের জডরেল ব্যাঙ্কের নিউফিল্ড রেডিও-জ্যোতি-বিজ্ঞান গবেষণাগার। এই গবেষণাগারেরই শক্তিশালী রেডিও টেলিসকোপ মার্ক-১, দু'শ পঞ্চাশ ফুট যার ব্যাস। সেই রেডিও টেলিসকোপে ধরা পড়ল অদ্ভুত এক বেতার সংকেত। বিপ্ বিপ্-বিপ্ বিপ্-বিপ্ বিপ্………। জডরেল ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ তখন বিশ্বখ্যাত রেডিও-জ্যোতি-বিজ্ঞানী ডঃ বার্নার্ড লোভেল। মহাকাশ থেকেই তো আসছে ওই বেতার সংকেত! ব্যাপার স্যাপার দেখে তিনি তো থ। না, দূর নক্ষত্র থেকে নয়। এ সংকেত তো মনে হচ্ছে আকাশের কোন কাছাকাছি অঞ্চল থেকেই আসছে। বড় জোর ১০০ অথবা ২০০ মাইল দূর থেকে।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল আসল খবর। ৪ অকটোবর ১৯৫৭। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা মহাকাশে স্থাপন করেছেন একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। ওজন ১৮৪ পাউণ্ড। উপগ্রহটির নাম দিয়েছেন তাঁরা স্পুতনিক-১। চাঁদের মত সেই উপগ্রহটিই পৃথিবীর চারপাশে পরিক্রমণ করছে। আর তার মধ্যে রাখা বেতার যন্ত্র থেকে এগিয়ে আসছে সংকেত —বিপ্ বিপ্—বিপ্……। খবরটি শুনে সারা পৃথিবীর মানুষ চমকে উঠল। মানুষের তৈরি কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পরিক্রমণ করছে—ব্যাপারটা অনেকের কাছেই অসম্ভব বলে মনে হয়েছিল তখন।

কিন্তু প্রথম চমক কাটতেই আবার চমক। ৩ নভেম্বর সোভিয়েত দেশ থেকে আকাশে তোলা হল আবার একটি কৃত্রিম উপগ্রহ। স্পুতনিক-২। এটি আরও বড়। ওজন ১১২০ পাউণ্ড। এবং মজার ব্যাপার, এবার শুধু যন্ত্রপাতি নয়, এই উপগ্রহে নভশ্চর হিসেবে পাঠান হল একটি জ্যান্ত প্রাণী—কুকুর। নাম লাইকা। মহাকাশ পরিবেশ প্রাণীর উপর কতটা প্রভাব বিস্তার করে সেটা জানাই ছিল এর উদ্দেশ্য। বলতে পারো, মানুষ নয়, —প্রথম মহাকাশযাত্রীর গৌরব অর্জন করল একটি কুকুর।

এর পর শুরু হল কি প্রচণ্ডই না প্রতিযোগিতা। একদিকে সোভিয়েত দেশ, আর এক দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫৭-র পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৮-র ১লা ফেব্রুয়ারি মহাকাশে পাঠান তাদের প্রথম উপগ্রহ এক্‌স্প্লোরার-১। তারপর একে একে এক্‌সপ্লোরার-২, ৩, ৪। এক্‌সপ্লোরার-১এ পাঠাল যন্ত্রপাতি প্রথম জানাল সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ছ'শ মাইল ঊর্ধ্বাকাশে চল্লিশ ডিগ্রি উত্তর এবং চল্লিশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ বরাবর একটি বিকিরণ বলয় রয়েছে। কতকটা আচ্ছাদনের মত। মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জেমস এ. ভ্যান অ্যালেন এটি আবিষ্কার করলেন বলে এর নাম রাখা হল ভ্যান অ্যালেন বিকিরণ বলয়। পরে দেখা যায় পৃথিবীর চার হাজার মাইল ঊর্ধ্বাকাশে ওই ধরনের আরো একটি বলয় রয়েছে। এই বিকিরণ বলয় মহাকাশ থেকে আগত মহাজাগতিক রশ্মির বড় রকম একটি অংশ প্রতিহত করে বলে জীবজগৎ মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।

১২ এপ্রিল, ১৯৬১। সোভিয়েত দেশ প্রথম মানুষ পাঠালেন মহাকাশে। ইউরি গ্যাগারিন। তারপর সোভিয়েত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে একের পর এক পাঠান হল কখনও মহাকাশযান, কখনও কৃত্রিম উপগ্রহ। সোভিয়েত দেশ পাঠান মর্লনিয়া, জোণ্ড, কে.স্মক, ভেনেরা, মার্স, প্রভৃতি একাধিক মহাকাশ যান।

কখনও শুধুমাত্র যন্ত্রপাতি পাঠান হল। কখনও উদ্ভিদ, জীবাণু এবং মানুষ। একই ব্যাপার ঘটল মার্কিন দেশেও। ১৯৬২-র পর মার্কিন দেশ চাঁদে মানুষ পাঠানোর জন্যে প্রস্তুত হল। এর জন্যে প্রথমে কয়েকটি 'মার্কারি',

কয়েকটি 'জেমিনি,' এবং 'অ্যাপলো' মহাকাশ যান পাঠান হল। সেই সঙ্গে মানুষ যাতে নিরাপদে চাঁদের বুকে অবতরণ করতে পারে তার জন্যে চাঁদ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হল কয়েক ডজন মহাকাশ যানের সাহায্যে। রেঞ্জার, সার্ভেয়ার এবং অরবিটার—তাদের নাম। এই সব মহাকাশযানে মানুষ ছিল না। ছিল যন্ত্র। সেই যন্ত্রই নতুন নতুন তথ্য যোগাতে লাগল চাঁদ সম্পর্কে। অবশেষে অ্যাপলো-১১ নামক মহাকাশ যানে চড়ে ১৯ জুলাই, ১৯৬৯, চাঁদের বুকে নামলেন পৃথিবীর প্রথম মানুষ। নীল আর্মস্ট্রং। তাঁর পিছু পিছু নামলেন মাইকেল কলিনস। মানুষের ইতিহাসে কি বিস্ময়করই না ঘটনা।

অ্যাপলো ১১-র পর অ্যাপলো-১২, ১৪, ১৫, ১৬ এবং ১৭য় চড়ে আরও অনেকে চাঁদে গেলেন। মাঝপথে যান্ত্রিক গোলযোগ হওয়ায় অ্যাপলো-১৩ ফিরে আসে, চাঁদ পর্যন্ত আর পৌঁছতে পারেনি। যাই হোক এই

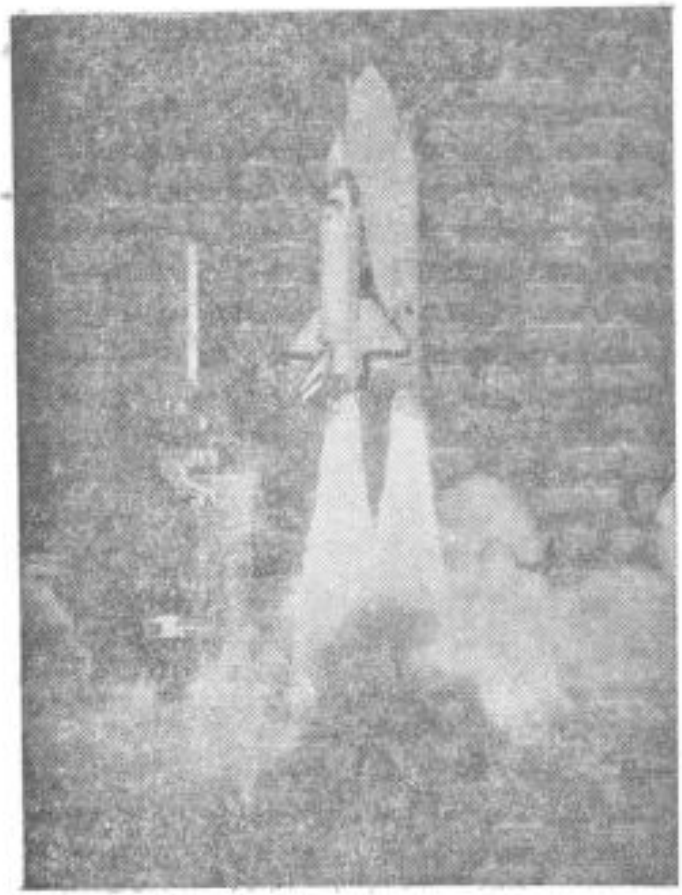

ফ্লোরিডার পুনর্যাত্রা। ৪৪ ঘণ্টার এই অভিযানে নভচারী জো এঞ্জেল ও রিগার্ড ট্রলি, তাঁদের পরিকল্পিত সব কটি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছেন।

সব অভিযান—চাঁদ সম্পর্কে আমাদের অনেকে নতুন কথা শুনিয়েছে। চাঁদে জল নেই, বাতাসও নেই বললেই চলে। কোন প্রাণীও নেই সেখানে।

জটিল যন্ত্রপাতি দিয়ে সাজিয়ে নতুন কথা জানার জন্যে মহাকাশ যান পাঠান হল শুক্র গ্রহে, মঙ্গলে। জানা গেল শুক্রেও কোন প্রাণী নেই। শুক্রের বাতাসে কার্বন ডাই-অকসাইডের পরিমাণ বেশি। মার্কিন দেশের মহাকাশযান ভাইকিং মঙ্গলের বুকে অবতরণ করে জানিয়ে দিল সেখানেও সে গাছপালা বা প্রাণীর কোন সন্ধান পায় নি। মার্কিন দেশ পাঠাল মানব আরোহীহীন মহাকাশ যান পাইওনিয়ার এবং ভয়েজার। জোড়ায় জোড়ায়। এই সব মহাকাশযান বৃহস্পতি এবং শনি গ্রহ সম্পর্কে নতুন তথ্য যুগিয়েছে। জানা গেছে, বৃহস্পতির উপগ্রহ ইও'-য় রয়েছে জীবন্ত আগ্নেয়গিরি, শনির রয়েছে একশর'ও বেশি বলয়। পাইওনিয়ার এবং ভয়েজার এখনও ছুটে চলেছে। যাচ্ছে ইউরেনসের দিকে। অবশেষে প্লুটোর কাছ দিয়ে চলে যাবে আমাদের সৌরমণ্ডলের বাইরে। এই সব মহাকাশযান গ্রহগুলি সম্পর্কে অনেকে নতুন কথা জানিয়েছে আমাদের।

সূর্যকে জানার জন্যে মহাকাশে পাঠান মহাকাশ যান থেকে মানুষ আবিষ্কার করল শুধু গবেষণা নয়, তার নিজের প্রয়োজনেও মহাকাশ বিজ্ঞানকে কাজে লাগান যায়। তৈরি হল নানা রকম উপগ্রহ। এই সব উপগ্রহে রইল নানা রকম যন্ত্র, টেলিভিশন ক্যামেরা। মার্কিন উপগ্রহ 'টাইরস' এবং সোভিয়েত উপগ্রহ মলনিয়ার সাহায্যে পৃথিবীর কোন জায়গার আবহাওয়া কখন কেমন থাকবে এখন অনায়াসেই আমরা জানতে পারি। সেবার আটলান্টিকে উঠল ঘূর্ণি ঝড়। সোভিয়েত কৃত্রিম উপগ্রহের নজরে পড়লো সেই ঝড়। দেখা গেল প্রবল বেগে সেই ঝড় নিউ-ইয়র্কের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে। খবরটা পৌঁছে দিতেই সতর্ক হল নিউইয়র্কের মানুষ। তারা প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে বাঁচল। বছর সাতেক আগে অন্ধ্রপ্রদেশে প্রবল ঘূর্ণি ঝড় হয়। সে খবরও আমরা আগে থেকে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে জানতে পারি। কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে এখন সহজে আমরা পৃথিবীর বহু জায়গার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। পাহাড় পর্বত মরুভূমি এবং সমুদ্র—যেখানে মানুষ সহজে যেতে পারে না, কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে ছবি তুলে সেই সব জায়গায় পেট্রোলিয়াম, খনিজ সম্পদ অথবা মৎস্য সম্পদ আছে কিনা। থাকলে কতটা রয়েছে খুব কম সময়ে অনায়াসে এখন আমরা জেনে নিই।

না। ভারতও থেমে নেই। আমরাও তৈরি করেছি

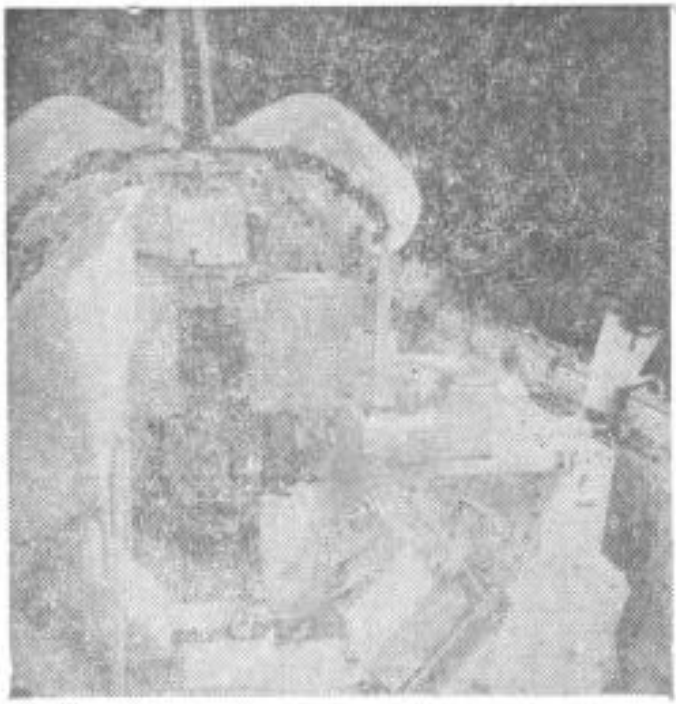

কলম্বিয়ার আভ্যন্তরীন যন্ত্রপাতি

মহাকাশ সংস্থা, যার নাম ইনডিয়ান স্পেশ রিসার্চ অর্গানাইজেশন বা সংক্ষেপে 'ইসরো'। অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটায় বসেছে রকেট তোলার মঞ্চ। তিরুবন্তমের কাছে থুম্বায় রকেট-মঞ্চ ছাড়াও গবেষণা হচ্ছে বড় রকেট তৈরির ব্যাপারে। বাঙ্গালোরে তৈরি হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহ। আমেদাবাদে মহাকাশ গবেষণার সাজসরঞ্জাম। এ ছাড়া শ্রীহরিকোটা, আমেদাবাদ, দিল্লি, নৈনিতাল, কর্ণাটকের সাগরে বসান হয়েছে রেডিও আন্টেনা। এদের সাহায্যে নিয়মিত আমরা নিজেদের এবং অন্যান্য দেশের উপগ্রহের সঙ্গে আমরা সংযোগ রাখছি। আমরা আকাশে তুলেছি আমাদের নিজেদের তৈরি উপগ্রহ আর্যভট, ভাস্কর, রোহিণী এবং অ্যাপ্‌ল। ১৯৯০ সালের মধ্যে ভারতের মাটি থেকে মহাকাশে তোলা হবে আবহাওয়া এবং যোগাযোগকারী উপগ্রহ। এখন তার কাজ চলছে। আমরা কিনেছি ইনসাট-১ উপগ্রহ। এই উপগ্রহ এই জুন মাস থেকেই আমাদের টেলিফোন এবং টেলিভিশন যোগাযোগের কাজ শুরু করবে।

এ সব কথা ভাবতে গেলে কেমন আশ্চর্য মনে হয়। এমনটি যে ঘটতে পারে কেউ কি ভাবতে পেরেছিল—পঁচিশ বছর আগে?

সম্পূর্ণ পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল

অধ্যাপক ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মার

উচ্চ মাধ্যমিক রসায়ন

প্রথম খণ্ড : একাদশ শ্রেণী

◎ প্রচুর গাণিতিক উদাহরণযোগে, নানা রাসায়নিক গণনা সহজবোধ্যভাবে করে দেওয়া আছে। ◎ অবজেকটিভ ও সাবজেকটিভ উভয় ধরনেরই প্রশ্নের সংকলন (এবং গ্রন্থে তার উত্তর) করা হয়েছে। ◎ ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নোত্তরের সাধারণ ত্রুটি ও তার সংশোধন এবং কিছু আদর্শ প্রশ্নোত্তর দিয়ে একটি বিশেষ উপযোগী অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ◎ উচ্চ মাধ্যমিক, শিক্ষা সংসদের আদর্শ প্রশ্নগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে, কিছু উত্তর পৃথকভাবে করা হয়েছে। ◎ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা—জয়েন্ট এন্ট্রান্স, আই. আই. টি—প্রভৃতি পরীক্ষার প্রশ্নগুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

দি পাইওনীয়ার পাবলিকেশনস ॥ ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

ভ্রম সংশোধন

২৮ পৃষ্ঠায় বিমান বসুর রচনায় ছবিতে বুধের অবস্থান ও সৌর কলঙ্কের নির্দেশ চিহ্ন ভ্রমবশতঃ মুদ্রিত হয়নি।

তিনটি অদ্ভুত জীব

ডাঃ বৃন্দাবন চন্দ্র বাগচী

এই পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ রকমের জীবজন্তু তাদের আপন আপন নিয়মে বাস করে, আপন আপন কৌশলে খাবার সংগ্রহ করে আবার বংশ বাড়ায়, আমরা কতটুকু জানতে পারি। কিন্তু যখন জানি তখন মনে হয় আশ্চর্য তো! এই প্রবন্ধে পাঠক পাঠিকাদের কাছে তিনটি ছোট ছোট প্রাণীর মজার চালচলনের পরিচয় দিই।

১নং ছবিটা দেখতে একেবারে বাঁদর নয় কি? যেন লেজে ঝুলছে এখনই লাফ দেবে। ঠিকই তাই। বাঁদরই বটে! তবে একেবারেই ছোট আর ঐ যে লেজ ঐটেই এদের

১ নং ছবি

বৈশিষ্ট্য। মেক্সিকো আর ব্রেজিলের জঙ্গলে এদের পাওয়া যায়। নাম গোল্ডেন স্পাইডার মাঙ্কি অর্থাৎ সোনালী মাকড়সা বাঁদর। এরা প্রায় গাছ ছেড়ে মাটিতে নামেই না বলা যায়। গাছের উপরেই জন্ম, বিচরণ আর মৃত্যু। মাটিতে নামতে একটুও ভালবাসে না।

ঐ লেজটি এদের অনেক কাজের যন্ত্র। ঐ লেজ দিয়ে ঝুলে অনায়াসে গাছের এ-ডাল থেকে ও-ডাল,

২ নং ছবি

এগাছ থেকে ওগাছ যাতায়াত করে। সোনালী রংয়ের লোম দিয়ে গাছে গাছে ঝুলোঝুলি করে বলে লোকে সোনালী মাকড়সা বাঁদর বলে। ঐ লেজ দিয়ে ওরা যে কোনও জায়গা থেকে চিনাবাদামের মত বস্তুও খুঁটে নিতে পারে। খাদ্য সাধারণতঃ গাছের ফল, কখনও পেলে পিঁপড়ের বা অন্য কীটপতঙ্গের ডিম।

২মং ছবি এক রকমের ছোট বিড়াল। নীল সাদা ডোরাকাটা দেহ। সাদা চামরের মত লোমওয়ালা লেজ। যে কোনও জীবজন্তু মানুষ যাকে ওরা শত্রু মনে করে তাকে দেখবামাত্র সামনের দুপায়ে ভর করে লেজটা ছবির মত আকাশে তুলে দোলাতে থাকে। তখন পিঠটাও টান হয়ে যায়। এতে যদি শত্রু ভয় পেয়ে না পালায় তবে ফিচ করে লেজের নীচ থেকে পিচকারীর মত দুর্গন্ধ জল মুখে চোখে ছিটিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি নিজেই পালায়। সেণ্ট্রাল আমেরিকাতে ওদের বাস। ওদেশের লোকেরা এর নাম দিয়েছে সিভেট ক্যাট। (সিভেট গন্ধ ছড়ানো কাঠ বিড়ালী) আবার অন্য নামও আছে স্পাইলোগোল। এরা খায় ছোট ছোট ইঁদুর আর পাখীর ডিম।

আর ৩নং প্রাণীটি সত্যই অদ্ভুত। যেন আমাদের জানা-শোনা কারও সঙ্গে খাপ খায় না। দেখে মনে হচ্ছে

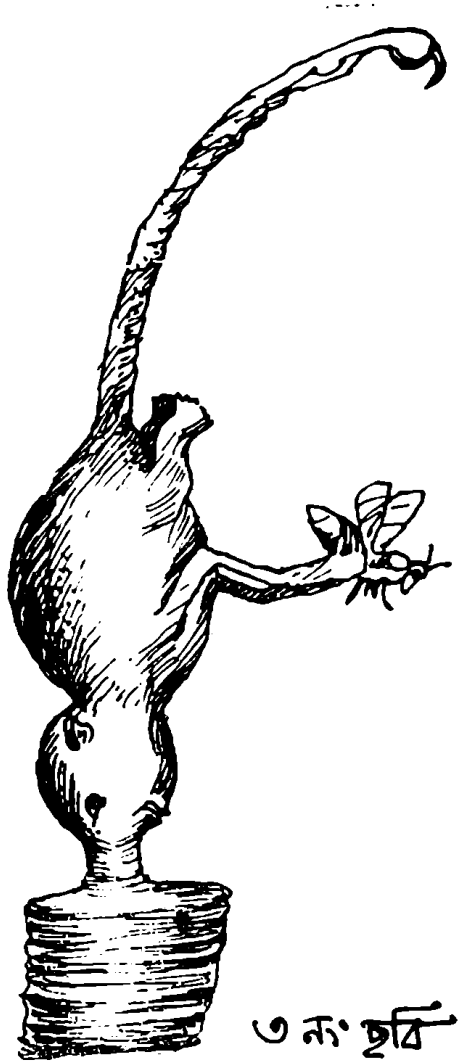

৩ নং ছবি

একটা ইঁদুর বুঝি মাথা নীচু করে কোন রবারের বলের মধ্যে নাক ডুবিয়ে ডিগবাজী খাচ্ছে কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। এই ছোট ইঁদুর জাতীয় প্রাণী এই রকম হেটমুণ্ড হয়েই চলে। এই যে বেলোর মত প্রত্যঙ্গ দেখা যাচ্ছে ওটা ওদের নাক। ওরা নিঃশ্বাস টেনে নিলে ঐ বেলোর কুচকে যায় তার পর আবার এর মধ্যে বাতাস ঢুকিয়ে দিলে ওটা হঠাৎ ফুলে উঠে লাফিয়ে ওঠে। ওরা এমনই করে নাক দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। পা দিয়ে চলে না। ঐ যে লম্বা লেজ ওটা দুলিয়ে দুলিয়ে ওরা ভারসাম্য রক্ষা করে। ঐ লেজের মাথায় যে নখের মত একটা জিনিস আছে ঐ দিয়ে ছোট ছোট পোকা ধরে সামনের বড় পা দুটিতে ধরিয়ে দেয় তারপর মুখে ঢুকিয়ে দেয়। লেজের মাথায় ঐ নখ দিয়ে ওরা যে ধরতে যাবে তাকে আঁচড়ে দেয়। ওখান থেকে এক রকমের রস বেরোয়। তার ফলে ঐ ক্ষত বিষাক্ত হয়ে যায়।

ক্যালেণ্ডারের মজা

চন্দন দেব

নিচের ছবিতে যেরকম দেখা যাচ্ছে, এরকম ক্যালেণ্ডার তোমরা হয়তো অনেকেই দেখেছো। দুটো ঘনকের বিভিন্ন পিঠে বিভিন্ন সংখ্যা এমন ভাবে লেখা আছে যাতে ঘনক দুটোকে উল্টেপাল্টে খুশি মতো সাজিয়ে মাসের পয়লা থেকে শেষ তারিখটি সহজেই লিখে ফেলা যেতে পারে। অর্থাৎ, 01, 02,...থেকে 31 তারিখ পর্যন্ত। ছবিতে ঘনক দুটো সাজিয়ে জানুয়ারী মাসের 25 তারিখ দেখানো আছে। প্রথম ঘনকের চারটে পিঠ (surface) লুকিয়ে আছে, আর দ্বিতীয় ঘনকের তিনটে পিঠ রয়েছে চোখের আড়ালে। প্রত্যেক পিঠেই ০ থেকে 9-এর মধ্যে যে কোন একটি সংখ্যা লেখা আছে। বলতে পারো ঘনক দুটোর লুকোনো পিঠ দুটোয় কোন্ কোন্ সংখ্যা লেখা আছে? উত্তরটা হয়তো সহজ, তবে জলের মতো সহজ নয়।

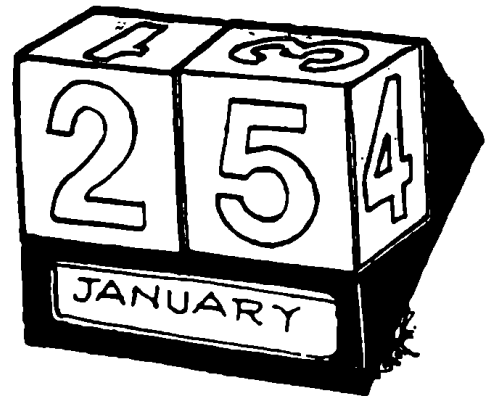

যদি না পারো, তাহলে···নীচেই উত্তরটা দেখে নাও। আরো জেনে রাখো, 1957-58 সালে এইরকম ঘনক ক্যালেণ্ডারের পেটেণ্ট নিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের জন সিঙ্গলটন এবং তাঁর নেওয়া পেটেণ্টের নম্বর ছিলো, 831572।

উত্তর : প্রথম ঘনকের লুকানো পিঠের সংখ্যা হল : 0, 6 **অথবা** 9, 7 **এবং** 8

এখানে মনে রেখো 6 **কে ওলটালেই** 9 **পাওয়া যায়, সুতরাং** 6 **এবং** 9 **দুটোই থাকার কোন দরকার নেই।**

দ্বিতীয় ঘনকের লুকানো পিঠের সংখ্যা হলো : 0, 1 **এবং** 2।

ভাবনা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

গাছের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক মৌলগুলির যথেষ্ট পরিমাণে জমিতে উপস্থিতি নিশ্চিত করে শস্যের উৎপাদন বাড়াবার জন্যে সার ব্যবহার করা হয়। অক্সিজেন, কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম, সালফার, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং লোহা এই ধরনের রাসায়নিক মৌলের মধ্যে পড়ে। মাটিতে এগুলির যে কোনটির অভাব ঘটলে উপযুক্ত সার ব্যবহার করে সেই অভাব মেটানো যায়।

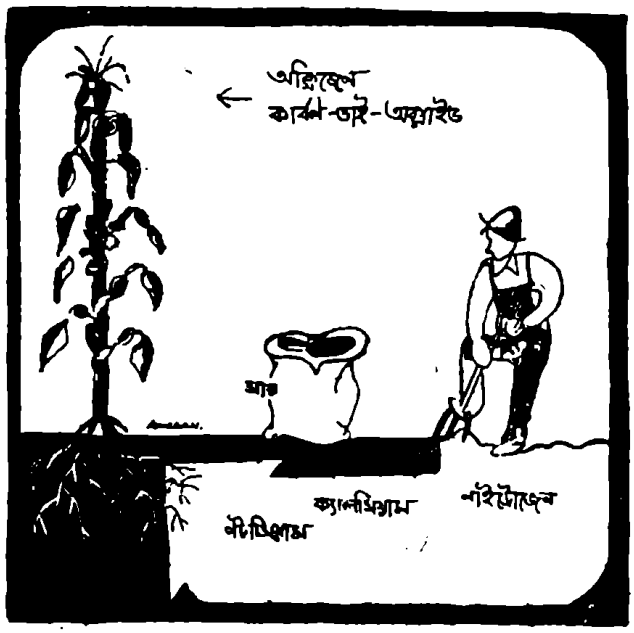

উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত জমির উর্বরতা প্রয়োজন মত রাখার জন্য চাষীরা প্রধানত প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করতেন। সাধারণত তাঁরা সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলির সামুদ্রিক আগাছা থেকে সার সংগ্রহ করতেন। জমির অম্লত্ব (acidity) নিবারণের জন্য চুনও ব্যবহার করা হত। জমির উর্বরতা ঠিক রাখার এই পদ্ধতি ব্যবহার করে রাসায়নিক মৌলগুলির দীর্ঘকালীন উপস্থিতি বজায় রাখা সম্ভব হলেও, কোন জমিতে ঐ মৌলগুলির এক বা একাধিকের একবার অভাব ঘটে গেলে—এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সেই অভাব পূরণ করা যেতো না।

আজকাল জমিতে ঠিকমতো রাসায়নিক সার প্রয়োগ করবার জন্য মাটি পরীক্ষা করে। কেবল রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে ভালো ফলনের নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না ; এর জন্য প্রাকৃতিক সারগুলির (যেমন মল এবং পচা গাছপালা) ব্যবহারও অত্যাবশ্যক।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই

ইউনেসকো ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত

অমরনাথ রায়ের

জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫·০০

সংখ্যা নিয়ে খেলা ৫·০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের

পশুপাখী-কীট-পতঙ্গ ৮·০০

মনি বাগচির

বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১২·০০

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১৫·০০

স্বপন বুড়োর

বুক অব নলেজ ১০·০০

শৈব্যা ● প্রকাশন বিভাগ

৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

রসায়নের সহজ পাঠ

অমরনাথ রায়

আগের অধ্যায়ে সংপৃক্ত হাইড্রোকার্বন যৌগ বা 'অ্যালকেন' এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। অ্যালকেনকে 'প্যারাফিন'ও বলা হয়। মিথেন (CH_4), ইথেন (C_2H_6), প্রোপেন (C_3H_8 বা $CH_3-CH_2-CH_3$), বিউটেন [C_4H_{10} বা $CH_3-(CH_2)_2-CH_3$], পেনটেন [C_5H_{12} বা $CH_3-(CH_2)_3-CH_3$] ইত্যাদি যৌগ অ্যালকেন বা প্যারাফিন গোত্রীয়। এদের সাধারণ সংকেত $Cn\ H_{2n+2}$. মিথেনের ক্ষেত্রে n-এর মান 1, ইথেনের ক্ষেত্রে 2, প্রোপেনের ক্ষেত্রে 3, বিউটেনের ক্ষেত্রে 4 এবং পেনটেনের ক্ষেত্রে 5.

যখন কোন অ্যালকেনের কার্বন পরমাণুগুলি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোজা শৃংখল গঠন করে তখন সেই হাইড্রোকার্বন যৌগকে নরম্যাল (n) অ্যালকেন বলে।

যেমন, নরম্যাল (n) বিউটেন :

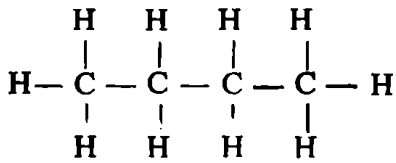

নরম্যাল (n) পেনটেন :

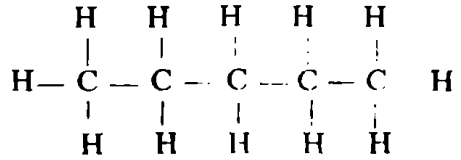

যখন কোন অ্যালকেন যৌগে একটি মাত্র শাখাশৃংখল থাকে, তখন তাকে আইসো (iso) অ্যালকেন বলে।

যেমন, আইসো বিউটেন :

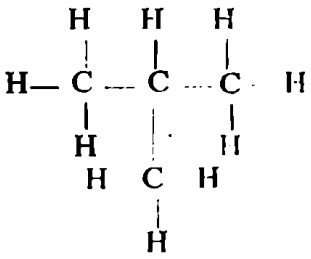

আইসো পেনটেন :

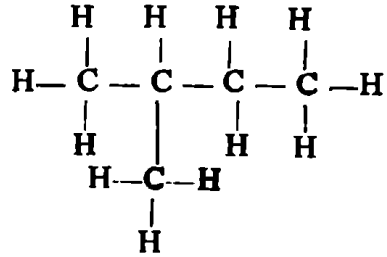

আবার যখন কোন অ্যালকেনে দু'টি শাখা শৃংখল থাকে, তখন তাকে নিয়ো (neo) অ্যালকেন বলে।

যেমন নিয়ো (neo) পেনটেন :

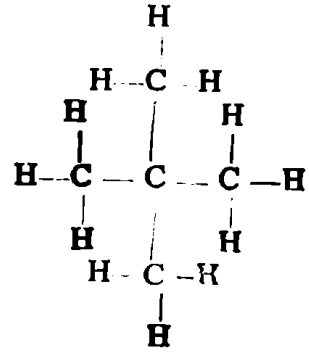

প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী, টারসিয়ারী এবং কোয়ার্টারনারী কার্বন পরমাণু :

কোন কার্বন পরমাণু যদি অপর একটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে তাকে প্রাইমারী কার্বন পরমাণু বলে।

কোন কার্বন পরমাণু যদি অপর দু'টি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে তাকে সেকেণ্ডারী কার্বন পরমাণু বলে।

অনুরূপভাবে কোন কার্বন পরমাণু তিনটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকলে টারসিয়ারী (Tertiary) এবং চারটি কার্বন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাকে কোয়ার্টারনারী (Quarternary) কার্বন পরমাণু বলে।

নরম্যাল বিউটেন এর গঠন সংকেত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তাতে দু'টি প্রাইমারী এবং দু'টি সেকেণ্ডারী কার্বন পরমাণু আছে।

আইসো বিউটেনে তিনটি প্রাইমারী ও একটি টারসিয়ারী কার্বন পরমাণু আছে।

আর নিয়ো পেনটেনে আছে চারটি প্রাইমারী ও একটি কোয়ার্টারনারী কার্বন পরমাণু।

জৈব যৌগের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য 'সমাবয়বতা'।

জৈব যৌগের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য

একটি বৈশিষ্ট্যের নাম হলো সমাবয়তা, ইংরেজী নাম Isomerism. কেবলমাত্র আণবিক সংকেত দেখে জৈব যৌগের প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না, কারণ একই আণবিক সংকেত একাধিক জৈব যৌগের থাকতে পারে। যেমন C_2H_6O আণবিক সংকেত দ্বারা দু'টি ভিন্নধর্মী জৈব যৌগ ইথাইল অ্যালকোহল (C_2H_5OH) ও ডাই মিথাইল ইথার (CH_3-O-CH_3) কে বোঝানো যায়। একই আণবিক সংকেত হওয়া সত্ত্বেও এই দুই জৈব যৌগের ধর্ম ও প্রকৃতি ভিন্ন। ভিন্ন এই কারণে যে, এই দুই যৌগের গঠন সংকেত, তথা অণুতে উপস্থিত পরমাণুগুলির বিন্যাস বিভিন্ন। এই রকম অনেক জৈব যৌগ আছে যাদের আণবিক সংকেত একই কিন্তু গঠন সংকেত ভিন্ন বলে যৌগগুলির ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মে অনেক পার্থক্য দেখা যায়। এমন সব যৌগকে বলা হয় 'সমাবয়বী যৌগ' (Isomer) আর একই আণবিক সংকেতযুক্ত বিভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট একাধিক যৌগ গঠনের রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় 'সমাবয়তা' (Isomerism)।

সমাবয়তা প্রধানত দু'রকমের, (i) সংযুতি সমাবয়তা (Structural isomerism) এবং স্টিরিও বা ত্রিমাত্রিক সমাবয়তা (Stereo isomerism)।

সংযুতি সমাবয়তাকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায় (i) শৃঙ্খল সমাবয়তা (ii) অবস্থানগত সমাবয়তা এবং (iii) কার্যকরীমূলক ঘটিত সমাবয়তা।

শৃঙ্খল সমাবয়তা (Chain isomerism) ঃ

C_5H_{12} আণবিক সংকেত দ্বারা তিনটি জৈব যৌগকে বোঝানো যায়।

(i) নর্ম্যাল পেনটেন ঃ

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$$

(ii) আইসো পেনটেন ঃ

$$\begin{matrix} H_3C \\ H_3C \end{matrix}\!\!>CH-CH_2-CH_3$$

(iii) নিয়ো পেনটেন ঃ

$$\begin{matrix} & CH_3 & \\ & | & \\ CH_3- & C & -CH_3 \\ & | & \\ & CH_3 & \end{matrix}$$

এই তিনটি যৌগের আণবিক সংকেত C_5H_{12} হ'লেও কার্বন শৃঙ্খলে কার্বন পরমাণুর ভিন্নতর অবস্থানের দরুন যৌগ তিনটির গঠন সংযুতিতে ও ধর্মে অনেক পার্থক্য দেখা যায়।—এরই নাম 'শৃঙ্খল সমাবয়তা' (Chain isomerism)।

অবস্থানগত সমাবয়তা (Positional isomerism) ঃ

C_4H_9OH আণবিক সংকেত দ্বারা চারটি বিভিন্ন অ্যালকোহল যৌগকে বোঝানো যায়। যেমন,

(i) প্রাইমারী নর্ম্যাল বিউটাইল অ্যালকোহল ঃ

$$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2OH$$

(ii) আইসো বিউটাইল অ্যালকোহল ঃ

$$\begin{matrix} H_3C \\ H_3C \end{matrix}\!\!>CH-CH_2OH$$

(iii) টার্সিয়ারী বিউটাইল অ্যালকোহল ঃ

$$\begin{matrix} & CH_3 & \\ & | & \\ CH_3- & C & -OH \\ & | & \\ & CH_3 & \end{matrix}$$

(ix) সেকেণ্ডারী নর্ম্যাল বিউটাইল অ্যালকোহল ঃ

$$\begin{matrix} CH_3-CH_2- & CH & -CH_3 \\ & | & \\ & OH & \end{matrix}$$

এই চারটি যৌগের আণবিক সংকেত C_4H_9OH হ'লেও এরা বিভিন্ন শ্রেণীর অ্যালকোহল। এই চারটি যৌগের পার্থক্যের কারণ— শৃঙ্খলের মধ্যে শ্রেণী নির্দেশক মূলকটির (—OH) বিভিন্ন স্থানে অবস্থান। —এরই নাম অবস্থানগত সমাবয়তা (Positional isomerism)।

বেঞ্জিন সঞ্জাত যৌগেও অবস্থানগত সমাবয়তা দেখা যায়। বেঞ্জিন রিং এর দু'টি H পরমাণু দু'টি একই রকম পরমাণু বা মূলক কিংবা দু'টি বিভিন্ন রকম পরমাণু বা মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হ'য়ে যে তিনরকম যৌগ উৎপন্ন করে, সেই তিনরকম যৌগই পরস্পরের অবস্থানগত সমাবয়বী'। যেমন, বেঞ্জিন অণুর দু'টি H পরমাণু দু'টি Br পরমাণু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হ'লে তিনটি বিভিন্ন বেঞ্জিন সঞ্জাত যৌগ উৎপন্ন করে। সেই তিনটি বিভিন্ন যৌগের গঠন সংকেত নীচে দেওয়া হলো।

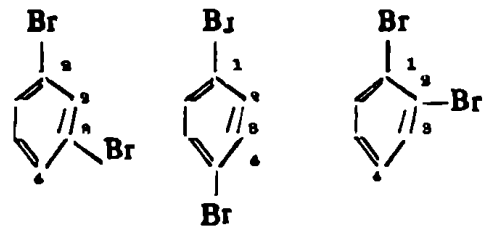

মেটা ডাইব্রোমো বেঞ্জিন।

প্যারা ডাইব্রোমো বেঞ্জিন।

অর্থো ডাইব্রোমো বেঞ্জিন।

দু'টি পাশাপাশি C পরমাণুর (1, 2 অবস্থানে) সঙ্গে অন্য দু'টি পরমাণু বা মূলক যুক্ত হ'য়ে যৌগ উৎপন্ন হ'লে তাকে 'অর্থো' যৌগ বলে। 1, 3 অবস্থানে অর্থাৎ একটি কার্বন পরমাণু বাদ দিয়ে দু'টি পরমাণু বা মূলক বেঞ্জিন রিং এ অবস্থান করলে তাকে 'মেটা' যৌগ বলে। আবার 1, 4 অবস্থানে অর্থাৎ দু'টি বিপরীত অবস্থানের C পরমাণুর সঙ্গে অন্য দু'টি পরমাণু বা মূলক যুক্ত হ'লে যে যৌগ উৎপন্ন হয়, তাকে 'প্যারা' যৌগ বলে।

কার্যকরীমূলক ঘটিত সমাবয়তা (Functional group isomerism) ঃ

C_3H_6O আণবিক সংকেত দ্বারা দু'টি বিভিন্ন শ্রেণীর জৈব যৌগকে বোঝানো যায়। এদের মধ্যে একটি হলো ডাই মিথাইল কিটোন বা অ্যাসিটোন ($H_3C-CO-CH_3$) এবং অপরটি হলো প্রোপিয়ন অ্যালডিহাইড ($CH_3-CH^{*}-CHO$)।

এই যৌগ দুটির আণবিক সংকেত এক হলেও এদের গঠনে কার্যকরী মূলক বিভিন্ন স্থানে থাকায় সমাবয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে যৌগ দু'টিও হয়েছে ভিন্নধর্মী।— এরই নাম 'কার্যকরীমূলক ঘটিত সমাবয়তা।'

মেটামেরিজম—(Metamerism) ঃ 'মেটামেরিজম' হলো জৈব যৌগের গঠন সংক্রান্ত সমাবয়তার একটি প্রকার ভেদ। একটি বহুযোজী পরমাণু বা মূলকের সঙ্গে বিভিন্ন অ্যালকিল মূলক (মিথাইল, ইথাইল, প্রোপাইল, বিউটাইল ইত্যাদি মূলক) যুক্ত হয়ে যদি একই শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন সমাবয়বী গঠন করতে সমর্থ হয় তবে ঐ যৌগগুলির মধ্যে যে সমাবয়তা দেখা যায় তারই নাম 'মেটামেরিজম'। আর ঐ যৌগগুলিকে বলা হয় পরস্পরের 'মেটামার'।

উদাহরণ ঃ—

নিম্নের উদাহরণগুলি মেটামার। এদের সবারই আণবিক সংকেত C_3H_9N

n প্রোপাইল অ্যামিন ঃ $CH_3-CH_2-CH_2-NH_2$

iso প্রোপাইল অ্যামিন ঃ $\begin{matrix}CH_3\\CH_3\end{matrix}\!\!>CH-NH_2$

ট্রাই মিথাইল অ্যামিন ; $CH_3-\overset{\displaystyle CH_3}{\overset{|}{N}}-CH_3$

এবারে আসা যাক স্টিরিও বা ত্রিমাত্রিক সমাবয়তার কথায়।

স্টিরিও আইসোমেরিজম (Stereo isomerism) ঃ

এই রকম সমাবয়তার ক্ষেত্রে দুটি সমাবয়বী (isomer) যৌগের একই আণবিক সংকেত ও একই গঠন সংকেত হওয়া সত্ত্বেও গঠন সংকেতে পরমাণুগুলির অবস্থানের তারতম্য থাকে। ত্রিমাত্রিক আকৃতির বিভিন্নতার জন্যে একই সংকেতের অণু স্টিরিও আইসোমার গঠন করে।

স্টিরিও আইসোমেরিজম আবার দু রকমের। (i) অপটিক্যাল আইসোমেরিজম এবং (ii) জিওমেট্রিক আইসোমেরিজম।

অপটিক্যাল আইসোমেরিজম এর ক্ষেত্রে একটি যৌগের গঠন সংকেত অপরটির গঠন সংকেতের দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের অনুরূপ হয়। ফলে বস্তু ও তার প্রতিবিম্ব পরস্পরের উপর সমপতিত হয় না। আয়নার সামনে দাঁড় করালে যেমন প্রতিবিম্ব দেখা যায়, এক্ষেত্রেও সেই রকমটি দেখতে পাওয়া যায়।

অপটিক্যাল আইসোমেরিজমের উপরোক্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, দু'টি সমাবয়বীতে কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুটির সঙ্গে বিভিন্ন পরমাণু বা মূলক বিভিন্ন দিক থেকে যুক্ত আছে। দ্বিতীয়টি প্রথমটির দর্পণে গঠিত প্রতিবিম্বের অনুরূপ। প্রথম সমাবয়বীতে d অর্থে বোঝায় dextro (দক্ষিণ) এবং দ্বিতীয় সমাবয়বীতে l অর্থে বোঝায় (levo) বাম। উপরোক্ত উদাহরণে একটি যৌগ অপরটির অপটিক্যাল আইসোমার।

দ্বি-বন্ধ যুক্ত জৈব যৌগের ক্ষেত্রে সাধারণত 'জিওমেট্রিক আইসোমেরিজম' দেখা যায়। নীচে এই ধরনের সমাবয়তার উদাহরণ দেওয়া হলো।

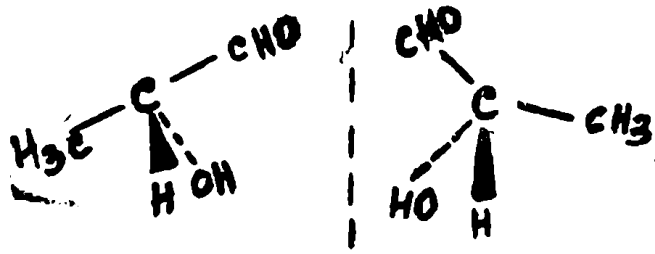

উদাহরণে বিউটিন এর জিওমেট্রিক আইসোমেরিজম দেখানো হয়েছে। cis কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'একই দিকের' থেকে এবং trans কথাটির অর্থ 'দ্বি-বন্ধের বিপরীত দিক' থেকে। trans-বিউটিনে লক্ষ্য কর H—H আড়াআড়িভাবে দ্বি-বন্ধের বিপরীত দিকে আছে। তেমনি CH_3-CH_3 মূলক দুটিও আড়াআড়ি ভাবে দ্বি-বন্ধের বিপরীত দিকে আছে।

জৈব যৌগের সমায়বতার কথা শেষ হলো।

॥ প্রশ্নাবলী ॥

1. প্যারাফিন গোত্রীয় জৈব যৌগ কোনগুলি? নরম্যাল, আইসো ও নিয়ো অ্যালকেন বলতে কি বোঝায়?

2. প্রাইমারী, সেকেণ্ডারী, টারসিয়ারী ও কোয়ার্টারনারী কার্বন পরমাণু বলতে কি বোঝ?

3. 'সমাবয়তা' কাকে বলে? সমাবয়বী যৌগ কাকে বলে? উদাহরণ সহযোগে 'শৃঙ্খল সমাবয়তা' বুঝিয়ে দাও।

4. অবস্থানগত সমাবয়তা ও কার্যকরীমূলক ঘটিত সমাবয়তা ব্যাখ্যা কর।

5. মেটামেরিজম বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও।

6. স্টিরিও আইসোমেরিজম ও অপটিক্যাল আইসোমেরিজম এর মধ্যে প্রভেদ কি, তা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

7. উদাহরণ সহযোগে বেঞ্জিন সঞ্জাত যৌগের অবস্থানগত সমাবয়তা ব্যাখ্যা কর।

8. Cis এবং trans জৈব যৌগ বলতে কি বোঝ?

9. $C_4H_{10}O$ আণবিক সংকেত বিশিষ্ট সকল যৌগের গঠন সংকেত ও নাম লেখ।

10. বেঞ্জিন রিং এ অর্থো, মেটা ও প্যারা অবস্থান গঠন সংকেত লিখে বোঝাও।

11. নীচে ল্যাকটিক অ্যাসিডের দু'টি অপটিক্যাল আইসোমার এর গঠন সংকেত দেওয়া হলো। এর মধ্যে কোনটি d-ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং কোনটি e-ল্যাকটিক অ্যাসিড তা লেখ। d এবং e বলতে কি বোঝ?

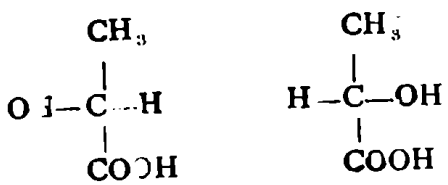

12. একটি অ্যারোমেটিক জৈব যৌগের আণবিক সংকেত C_7H_8O, গঠনসংকেত

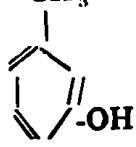

যৌগটির নাম কি?

(ক্রমশঃ)

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান
আয়োজিত
রচনা প্রতিযোগিতা

দ্বিতীয় পর্যায়

মান: নবম ও দশম শ্রেণী

প্রথম পুরস্কার ৫০, দ্বিতীয় ৩০, তৃতীয় ২৫

বিষয়সূচী

বিরল প্রাণী ॥ শব্দ সংখ্যা ॥ ২৫০

ভৌগোলিক আবিষ্কার ॥ " ৩০০

মহাকাশ গবেষণা ॥ শব্দ সংখ্যা ৪০০

নিয়মাবলী

[এক] মার্জিন সহ পৃষ্ঠার একদিকে পরিষ্কার হস্তাক্ষরে রচনা লিখে পাঠাতে হবে।

[দুই] নীচের কুপনটি পূরণ করে রচনার সঙ্গে পাঠাতে হবে।

[তিন] প্রেরিত রচনার ফেরত পাঠানো সম্ভব হবে না: পুরস্কৃত রচনা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের দপ্তরে রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ: ৩০শে জুন, ১৯৮২

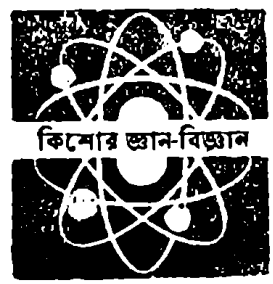

প্রতিযোগীর নাম:..................বয়স.........

ঠিকানা:..

বিদ্যালয়ের নাম ঠিকানা:..............................

শ্রেণী..........................রচনার বিষয়..........

প্রতিযোগীর স্বাক্ষর..................................

প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর..........................

জীবনবিজ্ঞানের প্রথম পাঠ

আমাদের পরিবেশ বাতাস—জল

ডক্টর তারক মোহন দাস

গতবারে জীব ও জড় সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছিল। কয়েকটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, যার সাহায্যে বোঝা যায় একটি গাছের পাতার মধ্যে জীবন আছে কি নেই। একটি ফুল সজীব কি মৃত।

আমাদের চারপাশে এই রকম অজস্র জীব ও জড়-পদার্থ ছড়িয়ে রয়েছে। ঐগুলি নিয়েই আমাদের জগৎ, আমাদের নিজস্ব পরিবেশ। আমাদের জীবন অত্যন্ত ঘনিষ্ট ভাবে জড়িত এবং নির্ভরশীল এই সমস্ত জীব ও জড় পদার্থগুলির ওপর।

আমাদের চারপাশে অর্থাৎ আমাদের পরিবেশের মধ্যে বহু রকম জীব রয়েছে, তাদের দুটি প্রধান ভাগ করা হয়, —তা হল নানা রকম গাছপালা ও জীবজন্তু, অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণী। এই উদ্ভিদ ও প্রাণী হল আমাদের পরিবেশের জীব উপাদান। তেমনি পরিবেশের প্রধান জড় উপাদান বলতে আমরা দেখতে পাই—আমরা যার ওপর বাস করছি সেই মাটি একটি। মাটির মধ্যে রয়েছে জল, সমুদ্রে রয়েছে জল, ভূ-পৃষ্ঠের ১০০ ভাগের প্রায় ৭০ ভাগই জল,—এই জল হল একটি জড় উপাদান। আমাদের চারপাশে ঘিরে রয়েছে বাতাস,—এই বাতাস হল আর একটি জড় উপাদান। সূর্য থেকে আলো ও উত্তাপ পাই, এই আলো না হলে সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরী করতে পারে না। ঐ খাদ্য না হলে আমরা শক্তি পাই না। সূর্যের বিকীরণই পৃথিবীর সকল শক্তির উৎস।

সুতরাং সূর্যের আলো ও উষ্ণতা আমাদের পরিবেশের আর একটি অতি আবশ্যকীয় উপাদান।

এই মাটি, জল, বাতাস ও আলো প্রকৃতির এই জড় উপাদানগুলি উদ্ভিদ ও প্রাণীরা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে, সতর্কতার সঙ্গে ও যত্নের সঙ্গে ব্যবহার করে থাকে—যাতে এই জড় উপাদানগুলি নষ্ট বা বিকৃত না হয়, এই কারণেই তারা বংশ পরম্পরায় কোটি কোটি বছর ধরে পৃথিবীতে টিকে আছে। এই উপাদানগুলির কোন একটি বিকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সকল জীবেরই পরম ক্ষতি হত।

মানুষ একা বাস করে না। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। অনেকগুলি পরিবার এক সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে শহরে ও গ্রামে। কিন্তু কি শহরে কি গ্রামে আমাদের সমাজের সব মানুষকেই সব সময় নির্ভর করতে হয়—অন্ন-বস্ত্রের জন্য উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর ওপর। শ্বাসকার্যের জন্য বাতাসের অক্সিজেনের ওপর, তৃষ্ণা নিবারণের জন্য জলের ওপর, বাসস্থানের জন্য ইঁট, কাঠ, লোহা, সিমেন্ট, পাথর ও মাটির ওপর।

আমাদের এখন তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে শহরে বা গ্রামে, আমাদের নিজস্ব পরিবেশের মধ্যে এই উদ্ভিদ, প্রাণী মাটি, জল, বাতাস ও আলো ঠিকমতো ব্যবহার করছি কি না—কিংবা আমাদের দ্বারা এগুলি বিকৃত বা ধ্বংস হচ্ছে কি না। আমাদের সমাজের প্রত্যেক মানুষেরই এটা দেখা দরকার। জীবনবিজ্ঞান শিক্ষার এটাই অন্যতম মূল উদ্দেশ্য। কারণ এরই ওপর আমাদের নিজেদের বেঁচে থাকা এবং সমাজের প্রকৃত স্থায়ী সমৃদ্ধি, এই দুটি বিষয়ই নির্ভর করছে।

কিন্তু কি ধরণের পরীক্ষা আমরা করতে পারি যার সাহায্যে বুঝতে পারব পরিবেশের এইসব উপাদানগুলি বিকৃত বা বিনষ্ট হচ্ছে?

বাতাসের কথাই ধরা যাক। আমাদের পাঠ্যপুস্তকে লেখা আছে বাতাসে প্রায় শতকরা ২০৬ ভাগ অক্সিজেন আছে, ৭৭ ভাগ নাইট্রোজেন আছে, ০·০৩ ভাগ কার্বন ডাইঅক্সাইড আছে, ১·৪ ভাগ জলকণা আছে এবং অন্যান্য গ্যাস আছে ০·৮ ভাগের কত। কিন্তু এইরকম বিশুদ্ধ বাতাস পৃথিবীর কোথাও তুমি খুঁজে পাবে না। আমাদের বাতাসে সব সময়ই প্রচুর ধূলিকণা, ধোঁয়া, ঝুল-কালি, নানা রকম ফুলের পরাগ, জীবাণু ও ভাইরাস ভাসমান অবস্থায় থাকে। কিন্তু কেমন করে তা জানা যেতে পারে? তা জানবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল একটি পরিষ্কার কাঁচের পাত্র ওজন করে হাতের ওপর রেখে দাও, একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর (২৪ বা ৪৮ ঘণ্টা পর) তা আবার ওজন করে দেখ, দেখবে ওজন বেড়ে গেছে,

বাতাসের ধূলিকণা পাতের মধ্যে জমা হবার ফলেই এই ওজন বেড়েছে। এখন পাতের তলের ক্ষেত্রফল থেকে তোমরা প্রতি বর্গ-মিটারে বা প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে কত ধূলিকণা বাতাস থেকে তোমাদের শহরের ওপর ঝরছে তা সহজেই বার করতে পার। রাস্তার ধারের একটা বট বা অশ্বত্থ গাছের একটি পাতা ছিঁড়ে এনে প্রথমে দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর, তারপর একটি পরিষ্কার তুলির সাহায্যে পাতার দু-পিঠে যত ধূলি জমেছে তা ঝেড়ে ফেল, তার পর পাতাটি দ্বিতীয় বার ওজন কর, এখন প্রথম ওজন থেকে দ্বিতীয় ওজন বাদ দিলেই গাছের পাতায় কতটা ধূলি জমেছিল বুঝতে পারবে। একটি হাতলওলা লেন্স নিয়ে যদি এই ধূলিকণিকাগুলি পরীক্ষা কর তাহলে আশ্চর্য হয়ে যাবে তার মধ্যে রকমারি পদার্থের সমাবেশ দেখে। বালুকণা, ভুসো-কালি, পরাগ, রেণু ছাড়াও নানা বিচিত্র আকার ও বর্ণের কেলাস (Crystals) তোমাদের চোখে পড়বে। ঐগুলি বাতাসের মধ্যেই ছিল এবং আমাদের শরীরের শ্বাস যন্ত্রের মধ্যেও যায়।

বাতাসে দূষিত গ্যাস থাকলে আমরা অনেক সময় তা গন্ধের সাহায্যে বুঝতে পারি। পথেঘাটের আবর্জনা ও মরা জন্তু-জানোয়ারের পাশ দিয়ে যাবার সময় আমরা তা টের পাই। কুণ্ডলী পাকানো কালো ধোঁয়াতো চোখেই দেখা যায়, চোখে লাগলে চোখ জ্বালা করে। শহরে বিকাল বেলায় অনেকেরই চোখ জ্বালা করে, দূষিত গ্যাসের প্রভাবেই এটা ঘটে। বাতাসে অনেক সময় কার্বন মনো-অক্সাইডের মত অতি মারাত্মক গ্যাস এসে মেশে, কোন দহন করবার সময় এই গ্যাস তৈরী হয়, কিন্তু এই গ্যাসের কোন গন্ধ নেই, চোখেও দেখা যায় না। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে আগুন জ্বালাবার ফল তাই অতি মারাত্মক হয়ে থাকে। আমাদের দেশে শীত কালে বেশ কিছু লোক মারা যায় এই ভাবে।

কিন্তু এই দূষিত বাতাসের হাত থেকে বাঁচবার উপায় কি? দু-ভাবে সেটা করা যেতে পারে। দূষিত পদার্থ বাতাসে যাতে না মেশে তার ব্যবস্থা করা এবং আমাদের বাড়ীর চারপাশে প্রচুর গাছপালা রোপণ করা। বাতাসের বেশীর ভাগ দূষণের জন্য দায়ী হচ্ছে আমাদের কল-কারখানা ও মোটর গাড়ীগুলি। এজন্য পৃথিবার উন্নত দেশগুলিতে প্রতিটি মোটর গাড়ীর ধোঁয়া নির্গমনের নলের সঙ্গে একটি ছোট যন্ত্র বসান থাকে যাতে মোটর-ইঞ্জিনের ধোঁয়া বাতাসে এসে না মেশে। আমাদের দেশে আজ এটার অত্যন্ত দরকার। তাছাড়া প্রতি কারখানাতেই ধোঁয়া নির্গমনের স্থানে নানা রকম যন্ত্র বসানর ব্যবস্থা আছে যাতে ধোঁয়া সরাসরি বাতাসে না মেশে।

আমরা জানি গাছেরা সালোকসংশ্লেষের সময় প্রচুর অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড সহ যথেষ্ট দূষিত গ্যাস বাতাস থেকে শোষণ করে। বাতাসের সূক্ষ্ম ধূলিকণাও যথেষ্ট পরিমাণে পাতার দু-পিঠে আটকে রাখে, যার পরীক্ষার কথা আগেই বলেছি। সুতরাং আমাদের পরিবেশের মধ্যে যদি যথেষ্ট পরিমাণে গাছ-পালা রোপণ করি, এবং তাদের যত্ন করে বাঁচিয়ে রাখতে পারি তাহলে দূষিত বাতাসের সমস্যা কিছুটা দূর হতে পারে। তাছাড়া

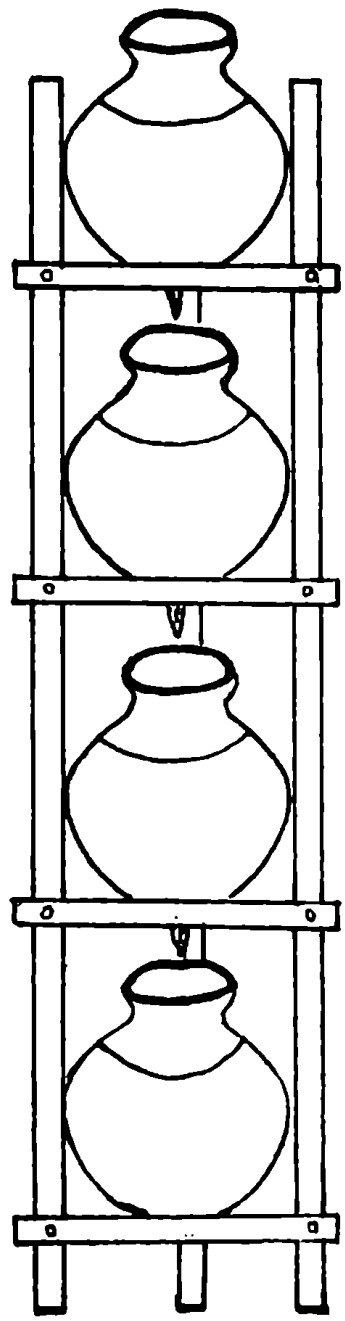

গাছেরা প্রচুর পরিমাণে মাটি থেকে জল তুলে বাতাসে মিশিয়ে দেয়, তার ফলে আমাদের পরিবেশ ঠাণ্ডা থাকে, বাতাসে জলকণার পরিমাণ বাড়ে, মেঘ সৃষ্টি হয়, বৃষ্টিপাত হয়। গাছেরা শিকড়ের জাল বিছিয়ে মাটির সূক্ষ্ম কণাগুলি আটকে রাখে, ভূমিক্ষয় নিবারণ করে, মাটির উর্বরতা বজায় রাখে। এই সব কাজ যদি আমাদের যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে করতে হত তাহলে আমাদের বহু লক্ষ টাকা ব্যয় হত। হিসাব করে দেখা গেছে একটি বৃক্ষের কাছ পঞ্চাশ বছর ধরে যে সব উপকার পাওয়া যায় তার আর্থিক মূল্য পনেরা লক্ষ্য টাকারও বেশী।

গাছের তাই কোন বিকল্প নেই। আমাদের পরিবেশের এই উপাদানগুলির পারমাণ ও গুণাগুণ যথাযথ ভাবে রক্ষা করতে হলে, অর্থাৎ পরিবেশের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে শহর ও গ্রামে যেখানে এক

সঙ্গে অনেক মানুষ বাস করে, অনেক কলকারখানা ছড়িয়ে আছে সেখানে অনেক বেশী করে বৃক্ষ রোপণ করা দরকার এবং তাদের সযত্নে পালন করা দরকার। তাছাড়া আমাদের অরণ্যগুলিকেও সযত্নে রক্ষা করা দরকার—এ বিষয়ে পরে আরো আলোচনা করব।

পরিবেশের আর একটি জরুরী উপাদান হল—জল। জলেরও কোন বিকল্প নেই। জল ছাড়া কোন জীবের এক মুহূর্তও চলে না, জলের আর এক নাম তাই জীবন। বিশুদ্ধ জল গন্ধহীন, বর্ণহীন। ঘোলা জল মাত্রই দূষিত। একটি কাঁচের গ্লাসে ঘোলা জল রেখে দাও, পরদিন দেখবে তলায় কত মাটি জমাট, এক ফোঁটা ঘোলা জল যদি অনুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাও তাহলে দেখবে তাতে কত জীবাণু করেছে। এই দূষিত জল পান করে পৃথিবীতে প্রতিদিন ২৫,০০০ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। আমরা যে সমস্ত সংক্রামক ব্যাধিতে ভুগি তার শতকরা ৯০ ভাগই জলের দ্বারা সংক্রমিত হয়। জলের এই রোগ জীবাণু ধ্বংস করবার সবচেয়ে সহজ উপায় হল জল ফুটিয়ে পান করা। ফোটান জল পান করা সবচেয়ে নিরাপদ। পুকুর বা নদীর জল যদি ঘোলাটে হয় তাহলে ঐ জল একটি বড় পাত্রের মধ্যে রেখে কাপড়ের একটি টুকরয় কিছু ফটকিরি বেঁধে জলের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে। দেখা যাবে ময়লাগুলি পাত্রের তলায় থিতিয়ে পড়ছে। এখন ওপর থেকে পরিষ্কার জল অন্য একটি পাত্রে ঢেলে নিয়ে ফুটিয়ে নিতে হবে। এভাবেও বিশুদ্ধ পানীয় জল পাওয়া যায়।

ফটকিরির পরিবর্তে ফিলটার বা ছাঁকনি যন্ত্রের সাহায্যেও জল পরিষ্কার করা যায়। তোমরাও এই রকম একটা ছাঁকনি-যন্ত্র তৈরী করতে পার। প্রথমে কাঠ বা বাঁশ দিয়ে একটা তেপায়া তৈরী করে নিতে হবে যাতে চারটে কলসি পর পর বসান যায়, ছবিতে যেমন দেখা যাচ্ছে। চারটে নূতন ও সমান মাপের কলসি নিয়ে যে কোন তিনটির তলায় একটা করে ছিদ্র কর। ঐ ছিদ্রের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার কাপড় বা পাটের পলতে লাগিয়ে দাও। সবচেয়ে ওপরের কলসিতে কিছু পরিষ্কার করে ধোয়া বড় বড় নুড়ি রাখ। তার নীচের কলসিতে কিছু ধোয়া পরিষ্কার কাঠ কয়লা এবং তার নীচের কলসিটি পরিষ্কার বালি দিয়ে অর্ধেক ভর্তি কর। যে কলসিতে ছিদ্র নেই সেটা সবচেয়ে নীচে রাখ।

এখন সবচেয়ে ওপরের কলসিতে ময়লা ঘোলাটে জল প্রথমে ফুটিয়ে নিয়ে ঢেলে দাও। বড় বড় ময়লা নুড়ির মধ্যে আটকে যাবে। তারপর জল পলতে বেয়ে চুঁইয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় এসে পড়বে নীচের কলসিতে, সেখানে কাঠকয়লায় জলের বেশীর ভাগ ময়লা আটকে যাবে। যে ময়লা কাঠকয়লায় আটকাবে না তা তৃতীয় কলসির বালিতে ছাঁকা হয়ে যাবে। এই ভাবে সবচেয়ে নীচের কলসিতে পরিষ্কার পানীয় জল পাওয়া যাবে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের লক্ষণ হল বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং সুস্বাদু। পানীয় জল পরিষ্কার পাত্রে সব সময় ঢাকা দিয়ে রাখা দরকার। পরিবেশের জলের সঙ্গে প্রতিটি জীবের স্বাস্থ্য ও জীবন যাত্রা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত।

২৪, সারকুলার গার্ডেন রিচ রোড, কলি-২৩

খুদে বৈজ্ঞানিক / দিলীপ দাস

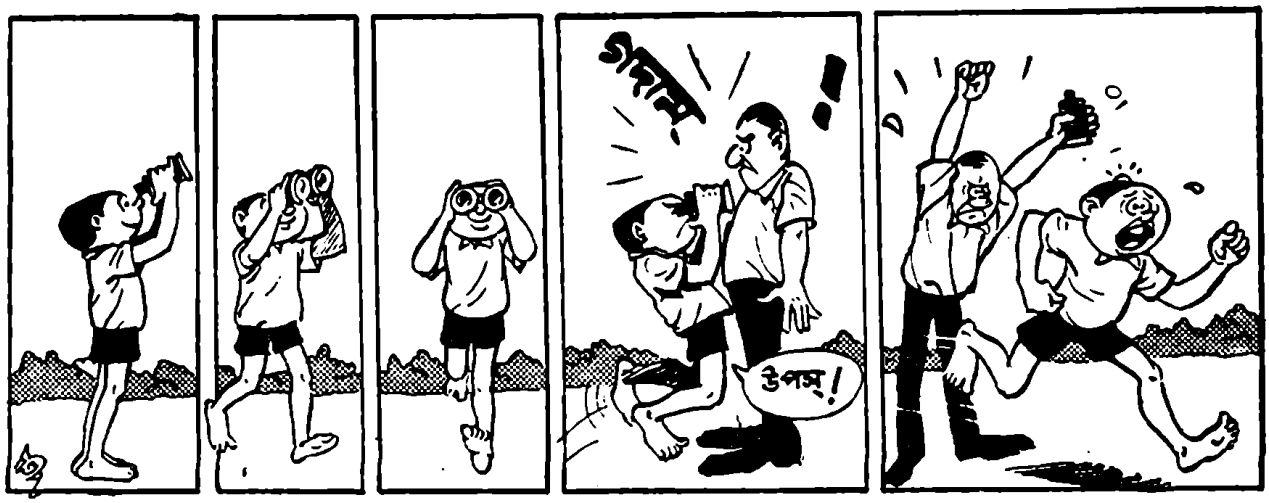

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মরণ সভা

গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রথম বার্ষিক স্মরণ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বিগত ২৪শে এপ্রিল ১৯৮২ মোহাবোধি সোসাইটি হলে। আয়োজন করেন দি সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গল।

বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ, প্রকৃতির কীট পতঙ্গের বিষয়ে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের যে অবদান ছিল সে সম্পর্কে মনোজ্ঞ ও বিস্তারিত আলোচনা করেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের অনুরাগ ও প্রতিভার কথা উল্লেখ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডক্টর ক্ষুদিরাম দাস।

অনুষ্ঠানে 'বিজ্ঞান পত্র'-পত্রিকা ও তার প্রগতি' শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানলেখক শ্রীসমরজিৎ কর।

অনুষ্ঠানে 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার সম্পাদক তার ভাষণে রাজ্য সরকারকে গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের স্মৃতি পুরস্কার প্রবর্তনের কথা ভেবে দেখবার জন্য বলেন। সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন অফ্ বেঙ্গলের পক্ষ থেকে একটি 'বাংলা বিজ্ঞান গ্রন্থাগার' তৈরী করবার জন্যও রাজ্য সরকারকে বলা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট বক্তাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক ডক্টর ক্ষেত্রপ্রসাদ সেনশর্মা, সুনীত রায়. সিদ্ধার্থ রায়, সুবীর ভট্টাচার্য্য, দীপক দাঁ, সব্যসাচী বসু, অজয় বাগচী, যুগলকান্তি রায়, অনিলবরণ দাস, ধ্রুবজ্যোতি মণ্ডল। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শ্রীশুভব্রত রায়চৌধুরী।

* * * *

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির যৌথ উদ্যোগে ৮ই এপ্রিল '৮২ সন্ধ্যায় "সত্যেন্দ্র ভবনে" প্রয়াত বিজ্ঞানসাধক ও বাংলাভাষায় বিজ্ঞান প্রচারের পথিকৃৎপ্রতিম ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডক্টর সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র। প্রধান অতিথি এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে অর্থমন্ত্রী ডক্টর অশোক মিত্র ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডক্টর রমেন্দ্রকুমার পোদ্দার এবং "গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য স্মারক" ভাষণ দেন ডক্টর বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য।

সভার প্রারম্ভে সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ভারতী দত্ত। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব ডক্টর সুকুমার গুপ্ত তাঁর ভাষণে গোপালচন্দ্রের কর্মময় জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। ডক্টর অশোক মিত্র তাঁর ভাষণে বলেন—গোপালচন্দ্র আমাদের কাছে মূলতঃ দুটি কারণে স্মরণীয় ও আদর্শ। এক-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ছাড়াও নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও মৌলিক গবেষণা চালানো সম্ভব—গোপালচন্দ্র তার উদাহরণ। গবেষণার ফলাফল মাতৃভাষায় প্রকাশ এবং মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনে গোপলচন্দ্র ছিলেন তন্নিষ্ঠ এবং নিবেদিত যা আজও দুর্লভ।

উপাচার্য্য ডক্টর পোদ্দার বলেন গোপালচন্দ্রের যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী থাকতো তবে তিনি তাঁর মৌলিক গবেষণার জন্য দীর্ঘদিন আগেই স্বীকৃতি অর্জন করতেন।

এছাড়া ডক্টর জয়ন্ত বসু, ডক্টর রতন মোহন খাঁ, ডাঃ গুণধর বর্মন এবং গোপালচন্দ্রের রচনাবলীর ইংরাজিতে অনুবাদ কর্মরত শ্রীমাধবেন্দ্র নাথ পাল গোপালচন্দ্রের উপর আলোচনা করেন।

সবশেষে সভাপতি ডক্টর সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র তাঁর ভাষণে গোপালচন্দ্রের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনা করে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পরিশেষে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতির সম্পাদক ডাঃ অনিলবরণ দাস। সভাশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের উদ্যোগে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র / লেখা ও ছবি : দিলীপ দাস

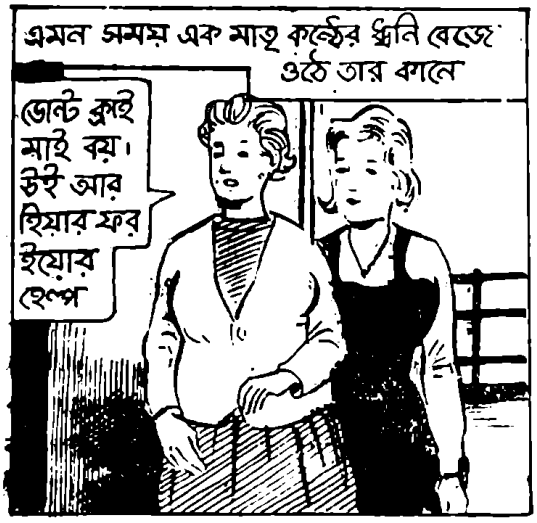

বসন্ত বউরি পাখিদের কথা

অজয় হোম

রেখা বসন্ত

শিবপুরের বটানিক্যাল গার্ডেনে ঘুরছি শীতের শেষে। পিকনিকের মরসুম আর নেই বললেই হয়। সুতরাং ভিড়টা বেশ কম। বড়ো বটগাছটার তলা থেকে ফিরছি বাঁদিকের রাস্তা দিয়ে। নার্শারি পার হয়েছি। বেশ বড়ো বড়ো গাছ। নির্জন পরিবেশ। রাস্তা ছেড়ে গাছের তলা দিয়ে চলেছি। হঠাৎ কানে এল—'কটুর-কটুর-কটুর-কটুর ..পাকড়াও-পাকড়াও' ডাক। কর্কশ নয় কিন্তু কোনো পাখি যেন একনাগাড়ে বেশ জোরে জোরে ডেকে চলেছে। মাঝে মাঝে অবশ্য থামছে।

ডাক শুনে পাখিটাকে চিনলাম। হাতিবাগান বাজারের পাখির হাট থেকে কিনে এনে একবার পুষেছিলাম। 'কটুর-কটুর' ডাক ছাড়াও কোনো কিছুতে অপছন্দ হলে রাগ প্রকাশ করতো পালক ফুলিয়ে ডানা নামিয়ে চঞ্চু ফাঁক করে 'ফ্যাচ ফ্যাচ' শব্দে।

পাখিটা পিপ্পল বংশের অপর এক প্রজাতি ; নাম—রেখা বসন্ত (মেগালাইমা লিনিয়েটা)। বাংলায় কোনো নাম না থাকাতে এই নামকরণ করি। নেপালী—খোটুর। কাছাড়ি—দাও টাকরা। হিন্দী—কোটার, বড়া বসনত্। ইংরেজি—লিনিয়েটেড বারবেট।

রেখা বসন্ত লম্বায় ১১ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা ঘাড় ও বুক পাটকিলে কিন্তু প্রতিটি পালকের উপর ছোটো ছোটো ফিকে সাদা রেখা। উপরের বাকি পালক ডানা সহ ঘাস-সবুজ। ডানার ওড়ার পালকে একটু পাটকিলের ছাপ। বুকের শেষের অংশ ও তলার সব পালক ফিকে সবুজ। লেজের পালকের ভিতরের অংশ নীলাভ। কনীনিকা পাটকিলে, চোখের পাতা ও তার পাশের পালকহীন অংশ হলুদ। চঞ্চু শিঙে-হলুদ। পা ও আঙুল ফিকে কমলা-হলুদ।

বাসস্থান—হিমালয়ের পাদদেশ ধরে পুবে নেপাল, পূর্ব ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোচীন থেকে মালয় জাভা বলিদ্বীপ। ভারতে ২টি উপজাতি। প্রথম (মে লি হজসনি)—পশ্চিম-মধ্য নেপাল থেকে উত্তর বিহার, সিকিম, আসাম, পশ্চিমবঙ্গে তরাই-ডুয়ার্স থেকে দক্ষিণে ওড়িশায় দ্বিতীয় (মে লি রানা)—পশ্চিম এবং পশ্চিম-মধ্য নেপালে।

খাদ্য—বটপাকুড় জাতীয় ফল, কীটপতঙ্গ ও তাদের শূক, ছোটো গিরগিটি-টিকটিকি, গেছো ব্যাঙ এবং বাসা থেকে পড়ে যাওয়া অন্য পাখির ছানা।

স্বভাব—রেখা বসন্ত পিপ্পল বংশের মধ্যে সবচেয়ে বড়। এদের জঙ্গলে যেমন দেখা যায় তেমন দেখা যায় যে কোনো বাগানে, শহরের পাশে বা বুকে বট-পিপুল কিংবা আমগাছে। রেখা বসন্ত কটুর-কটুর ডাক আরম্ভ করার আগে অনেক সময় একটা কর্কশ আওয়াজ করে নেয়। গলাটা যেন সাফ করে নিল এমন ভাব। ডাক মধ্যাহ্নের সবচেয়ে গরম সময়ে যেমন, তেমনি ডাকে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে। খুশি হলে তারা ভাব প্রকাশ করে গাছের ডাল থেকে শূন্যে অল্প লাফিয়ে গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করে। এছাড়াও আর একটা জোর শিস্ দেয় সুরে যা পিপ্পল বংশের অন্য কোনো পাখির গলায় শোনা যায় না। এই শিস্-এর মতো ডাকটা বার করে যখন পরিবারের অপর পাঁচজন ইতস্তত ছড়িয়ে আছে তাদের এক জায়গায় জড়ো করার জন্যে।

রেখা বসন্তের প্রজননকাল মার্চ থেকে জুলাই। গাছের ডালেই সুড়ঙ্গ করে ডিমঘর বানায় অন্যান্য বসন্ত বউরির মতো। উচ্চতা হয় ১০ থেকে ১৬ ফুটের মধ্যে, কখনও কখনও ৩০-৪০ ফুটেও দেখা যায়। ডিম পাড়ে অন্যান্যদের মতো ২ থেকে ৪টি সাদা, একটু লম্বাটে। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·২০, চওড়ায় ০·৮৭ ইঞ্চি।

জোকারে পাখি

পাখি দেখতে বেরিয়েছি। মার্টিন কোম্পানির ছোটো ট্রেন তখন চালু। পাতিপুকুর স্টেশন ছাড়িয়ে লাইন ধরে চলেছি। পাশের পিচঢালা রাস্তাটা বাঁদিকে বাঁক খেয়ে চলে গেল দমদম-নাগের বাজারের দিকে। নন্দীগ্রাম স্টেশন পার হয়েছি। চারিদিকে ঘন গাছপালা। আম জাম লিচু জামরুল বট অশ্বত্থ পাকুড় এবং আরও নানা গাছের সমাবেশ। গাছের উপর দিকে রোদ, মাঝে বা তলায় নেই। সঙ্গে আছে পাখি ধরা বেদে সতীশ আর চারু। তাদের পাতিপুকুরের ঝোপড়ি থেকে ডেকে নিয়েছি।

হঠাৎ একটা গাছ থেকে কর্কশ গলায় একটি পাখি ডাক শুরু করল 'কর্-র-র···কর্-র-র', তারপরেই একঘেয়ে উত্থানপতন হীন 'কাট্রু-কাট্রু-কাট্রু···কাটরাক—কাটরাক-কাটরাক'। ওর দেখাদেখি আর-একটি ওই ভাবে ডেকে উঠল, তারপর আরও একটা। এমনি করে পরপর কম করে ১৫-১৬টা হবে, তার বেশিও হতে পারে। ওদের ওই ঐকতানে কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। অদ্ভুত ধ্বনিতে বনানী মুখর হয়ে উঠল। এভাবে কোনো পাখির ছন্দতালহীন

কান ঝালাপালা ডাক কখনও শুনি নি।

এ কোন্ পাখিরে বাবা! আমার অবস্থা দেখে সতীশ আর চারু দুজনেই হেসে অস্থির। চারু হাসতে হাসতে বলল, দেখছেন না কেমন জোকার দিচ্ছে। এর নাম 'জোকারে পাখি'—বসন্ত বউরির জাতভাই।

সতীশই একটা পাখিকে বটগাছের উঁচু ডালে বসে ডেকে চলেছে দেখাল। সবুজ দেখতে, মাথাটা পাটকিলে, চঞ্চু একটু ফোলা আর বড়ো। অনেকটা রেখা বসন্তের মতো দেখতে।

পাখিটা পিপ্পল বংশের একটি প্রজাতি : নাম—জোকারে পাখি (মেগালাইমা জেইলানিকা)। হিন্দী—বড়া বসনত্। বিহারে বলে—সাওেরার। ইংরেজি—গ্রীন বারবেট। ভারত ও সিংহলে ৩টি উপজাতি।

জোকারেপাখি লম্বায় সাড়ে ১০ ইঞ্চি। স্ত্রী-পুরুষ একই দেখতে। মাথা গলা ও বুক পাটকিলের উপর বিবর্ণ লম্বাটে টান উপর থেকে নিচে। উপরের পালক উজ্জ্বল সবুজের উপর বিবর্ণ লম্বাটে টান শেষ হয়েছে সাদা ফুটকিতে।

জোকারে পাখি

ডানা ছোটো এবং গোলাকার। ওড়ার পালক পাটকিলে, ধারের দিকটা ফিকে। লেজ উজ্জ্বল সবুজ, নিচের দিক অর্থাৎ লেজের তলা ফিকে নীল। নাক উন্মুক্ত, কোনো পালক নেই। খোঁচা খোঁচা গোঁফ ও দাড়ি বংশের যা বৈশিষ্ট্য তা আছে। কনীনিকা লালচে-পাটকিলে, চোখের চারপাশ পালকহীন ত্বক, চঞ্চুর গোড়া পর্যন্ত কমলা। চঞ্চু ফিকে কমলা-পাটকিলে। পা ও আঙুল হালকা হলদেটে-পাটকিলে, নখর ধূসর।

বাসস্থান—প্রথম উপজাতি (মে জে কানিসেপস্) —পশ্চিম হিমালয়ের ২৫০০ ফুটের ভিতর হিমাচল প্রদেশের কাংড়া থেকে কুমায়ুন, পশ্চিম নেপালের তরাই অঞ্চল, পূর্ব গুজরাট, আবু পর্বত, উত্তর মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ থেকে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা থেকে গোদাবরীর তীর পর্যন্ত। দ্বিতীয়, 'ওয়েস্টার্ন গ্রীন বারবেট' (মে জে ইনর্নাটা)—পশ্চিম ভারতে মহারাষ্ট্রের গোদাবরীর তীর থেকে দক্ষিণে গোয়া, মহীশূর ও কুর্গ্ জেলায়। তৃতীয় (মে জে জেইলানিকা)—কেরালা, দক্ষিণ তামিলনাড়ু ও শ্রীলঙ্কায়।

খাদ্য—বটপাকুড়, জলপাই জাতীয় আঁটিযুক্ত শাঁসাল ফল, বৈঁচিজাতীয় যে-কোনো ছোটো সরস ফল, কীটপতঙ্গ, উড়ন্ত পিঁপড়ে বা উই, কখনসখন টিকটিকি-গিরগিটি। বাড়ির পিছনে লাগানো অর্থাৎ কিচেন গার্ডেনের টমাটো ধ্বংস করতেও দেখা যায়।

স্বভাব—জোকারে পাখি বেশ উচ্চ চূড়ার বৃক্ষবাসী। গাছের পাতার আড়ালে থাকে বলে সহজে নজরে পড়ে না, তবে ডাকের সঙ্গে মানুষের পরিচয় বেশি। ফলপাকুড়ই প্রিয় খাদ্য। সাধারণত একাই বিচরণ করে। বট-অশ্বত্থ গাছের যেখানে ঘন সমাবেশ সেখানে খাদ্যান্বেষণে ২০ কি তারও বেশি পাখি জমায়েত হয়। বুলবুল, হরিয়াল ইত্যাদি ফলাশী পাখির সঙ্গেও বিচরণ করতে দেখা যায়। শীতে চুপচাপই থাকে। বসন্তের আগমনে এদের সরব ছন্দহীন ঐকতান শুরু হয় এবং গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিনই জোকার দিয়ে চলে। মাঝে মাঝে রাতেও ডাকে। ওড়াটা অবশ্য বসন্ত বউরির মতোই—ডানার ঝাপট, ভেসে নিচে নামা, আবার ডানার ঝাপটে ওঠা।

প্রজননকাল ফেব্রুয়ারি থেকে জুন, মার্চ থেকে মে মাসই প্রশস্ত সময়। ৬ থেকে ৫০ ফুটের মধ্যে নরম কাঠের গাছের মোটা ডালে সুন্দর করে গোলাকার প্রবেশমুখ তৈরি করে সুড়ঙ্গ বানায়। বাসা বানাতে স্ত্রী-পুরুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যতক্ষণ না শেষ নয়। ডিমঘরে কোনো আস্তরণ বিছায় না। সুড়ঙ্গ খোঁড়া বাবদ কাঠের দুটো টুকরো যা কয়েকটা দেখা যায়।

ডিম পাড়ে সাধারণত ৩টি, তবে ২-৪টি ডিমও দেখা গেছে। সাদা লম্বাটে অল্প মসৃণ গোলাকার ভঙ্গুর ডিম। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই ডিমে তা দেয় ও সন্তান প্রতিপালন করে। ডিমের মাপ—লম্বায় ১·২০, চওড়ায় ০·৮২ ইঞ্চি।

অপর প্রজাতি

পিপুল বংশের অপর একটি প্রজাতির একবার মাত্র আমার চোখে পড়েছিল দার্জিলিঙ যাবার পথে। সুকনার জঙ্গলে গাড়ি খারাপ হয়ে যাবার জন্যে সারাইয়ের অপেক্ষায় জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে করতে পাখিটাকে দেখি। 'কুউ-টার···কুউ-টার টুউ-বুক···টুউ-বুক' এই ডাকই আমায় আকর্ষণ করে। গাছের প্রায় মগডালে বসে ডাকছে। ডাক অনেকক্ষণ ধরে চলে প্রায় জোকারে পাখির মতন। কাছেপিঠে অন্য কোনও সঙ্গীসাথী ছিল না। আকারে সেকরাপাখির মতন। নাম—

নীলকান বসন্তবউরি (মেগালাইমা অস্ট্রালিস)। কাছাড়ি—দাও টাকরা কাশিবা। ইংরেজি—ব্লু-ইয়ার্ড বারবেট।

লম্বায় সাড়ে ৬ ইঞ্চি। ঘাস-সবুজ দেহ, মাথায় অনেক রঙের সমাবেশ। খোঁচা খোঁচা দাড়ি চঞ্চুর ডগা ছাড়িয়ে। এই দাড়ি দেখে খুব মজা লেগেছিল। কপাল ও মাথার সামনের অংশ কালো, তার মাঝে মাঝে ফিকে নীল পালক ; মাথার পিছনের অংশ চকচকে নীল। কানের দু পাশ তামাটে নীল, উপরে ও নিচে একটি করে টুকটুকে লালের রেখা। চিবুক ও গলা তামাটে-নীল। চোখের ঠিক নিচে হলুদ আর উজ্জ্বল লাল, তারপরেই লম্বা কালো দাড়ি যা চিবুকের রঙকে আলাদা করে রেখেছে।

বাসস্থান—দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ থেকে টেনাসেরিয়াম, থাই ও ইন্দোচীন। ভারতে পূর্ব নেপাল, সিকিম, উত্তরবঙ্গ, ভূটান, আসাম, অরুণাচল, মণিপুর, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে।

খাদ্য—প্রধানত ফল পাকুড় ; কখনও কখনও পোকা-মাকড়।

স্বভাব গভীর জঙ্গলের পাখি। আচার ব্যবহার সেকরা-পাখির মতোই। ডাকটা ধাতব এবং খানিকটা জোকারে-পাখির মতো একঘেয়ে।

প্রজননকাল এপ্রিল থেকে জুনের প্রথমার্ধ। অন্যান্য বসন্তবউরির মতো গভীর জঙ্গলে গাছের ডালে সুড়ঙ্গ করে বাসা বানায়। স্ত্রী-পুরুষ দুজনেই ডিমে তা দেওয়া থেকে সন্তান প্রতিপালনে পরস্পরকে সাহায্য করে। ডিম পাড়ে ২-৪টি, সাদা রঙের। ডিমের মাপ—লম্বায় ০.৯৬, চওড়ায় ০.৭২ ইঞ্চি।

৮/২ বীরেশ গুহ স্ট্রীট কলকাতা ১৭

কোলাঘাট সায়েন্স হবিসেন্টার আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনী

দেবাশিস্ রায়

কোলাঘাটের সায়েন্স হবি সেন্টার মেদিনীপুর জেলা তথা পশ্চিমবাংলার অগ্রগণ্য বিজ্ঞান ক্লাবগুলির মধ্যে একটি। পরপর তিন বছর বিজ্ঞান প্রদর্শনী করার পর এ বছরও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে কোলা ইউনিয়ন হাইস্কুলে ১লা এপ্রিল থেকে ৪ঠা এপ্রিল অবধি উক্ত সংগঠনের উদ্যোগে ও পরিচালনায় একটি সুন্দর অথচ বড়ো বিজ্ঞান প্রদর্শনী হয়ে গেল।

কোলা ইউনিয়ন হাই স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্র কৃষ্ণেন্দু জানার 'রোবট ও ম্যাজিক' ক্লাস এইটের ছাত্র সব্যসাচী রায়চৌধুরীর 'ওভার হেড প্রজেক্টার' সত্যিই খুব ভালো লাগে। উদ্দালক সামন্ত ক্লাস টেন্-এ পড়ে। পদার্থ বিদ্যার 'হাইড্রো রেগুলেটর' নামে একটি মডেল তৈরী করেছিল। ভোগপুর হাই স্কুলের পার্থ প্রতিম দাসের 'থার্মো স্ট্যাও,' বাগনান হাই স্কুলের মিহির সামন্তর 'মজার বৈদ্যুতিক ঘণ্টা', ঝাড়গ্রাম গণবিজ্ঞান পরিষদের সঞ্জীব আদিত্যের 'অটোমেটিক টি সেন্টার', অসীম সিংহের 'ফ্লাড এলার্ড', কোলাঘাটের নীরোজ পালের 'ভুতুড়ে কল' সবার ভালো লেগেছে। কোলাঘাটের ছেলে দেবাশিস্ বসু 'ভারতীয় টাঁকশাল কালোবাজারী ও মূল্যবৃদ্ধি'-র উপর একটি সুন্দর মডেল করে সকলের মন কেড়েছে। এছাড়া গোবরডাঙ্গা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট (২৪ পরগনা) মৌমাছি পালন সম্পর্কে মডেল সহ তথ্যাদি হাজির করেছিল। বাগনানের নবতীর্থ সায়েন্স সেন্টারের হীরালাল সামন্ত 'গোবর গ্যাস'-এর মডেল সহ এর উপকারিতা সম্পর্কে সকলকে জানাচ্ছিল। বাগনানের ব্লুস্টার বিজ্ঞান ক্লাবের কাজী আব্বাস আহ্মেদের 'সঙ্গীতজ্ঞ পাখী' (Singging bird), টেঁপুর হাই স্কুলের তাপস সামুই-এর 'ফায়ার-এলার্ম,' স্বপ্না বসুর 'লোডশেডিং' খালোড় মৈত্রী সংঘের রঞ্জন দে'র 'আগুনের ঘণ্টা,' ও পাঁশকুড়া ফোটন সেন্টারের 'হ্যাণ্ড মেড প্রজেক্টার' সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এছাড়া কোলা ইউনিয়নের একাদশ শ্রেণীর ছাত্রী শংকরী শাসমলের বায়োলজির উপর 'মানবদেহের কিডনি সিস্টেম' ও হলদিয়ার দেভোগ হাই স্কুলের সুজয় বারিকের রসায়নের উপর 'মডিফায়েড কিপস্ সংযোগ প্রক্রিয়া' এক কথায় চমৎকার।

এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অরূপ রতন ভট্টাচার্য। প্রদর্শনীতে কিশোর-কিশোরীদের ভিড় সবচেয়ে বেশী ছিল।

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ঃ

সুপার পাওয়ার ইনজেকশন

নারায়ণ চক্রবর্তী

ক্লাসে ঢুকেই ক্ষুদে দেখে যে ব্ল্যাকবোর্ডে কে যেন সাদা খড়ি দিয়ে চার লাইনের ছড়া লিখে রেখেছে ঃ

ক্লাস নাইনের ল্যাগ্‌ব্যাগ্‌ সিং,—
লেখাপড়ায় দারুণ-চোস্ত্‌,
ছুটতে গেলেই ছিটকে পড়ে,
খেলাধূলায় বিপদগ্রস্ত্‌।

ছড়া পড়তে পড়তে ক্ষুদের ফর্সা কান মুখ চোখ লাল হয়ে যায়, ঝাঁ ঝাঁ ক'রে মাথায় রক্ত চড়তে থাকে। আড়-চোখে তাকিয়ে দেখে সনু-মানু-ভানু-হাঁদা আর ভোঁদা ওর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে টিপে হাঁসছে।

অক্ষম ক্রোধে ফুঁসতে থাকে ক্ষুদে, কিন্তু এক ঘুষিতে কারুর নাক ফাটিয়ে দেবার ক্ষমতাই নেই তার। বেশ ষণ্ডা ষণ্ডা চেহারা ওদের।

সুন্দর একটা ভালো নাম অবশ্য আছে, কিন্তু মা-বাবা-জেঠু ক্ষুদে বলেই ডাকেন আর স্কুলের ছেলেরা, পাড়ার ছেলেরা সবাই ওকে ডাকে ল্যাগ ব্যাগ সিং বলে। আর ওদেরই বা কী দোষ দেবো বলো, ক্ষুদে একেবারে হাড়-সর্বস্ব লম্বা, শুঁটকে শিড়িঙ্গে চেহারার ছেলে। এমন কি ওর প্রাণের বন্ধু পুন্টুও একদিন বলে ফেলেছিল,—"বাড়িতে তুই খাস না ক্ষুদে ?"

"খাবো না কেন ? মা দুধ দেন, ছানা দেন, মুরগীর ডিম, মাংস সব খেতে দেন। জেঠু ভালো ভালো টনিক কিনে দেন—"

"সেগুলো যায় কোথায় ? নিশ্চয়ই তোর পেটে একটা রাক্ষসী লুকিয়ে আছে, সেই সব খাবার খেয়ে ফেলে।"

হাসির ধুম পড়ে যায়। মুখখানা হাঁড়িপনা করে সেখান থেকে সরে যায় ক্ষুদে।

পনেরো বছর বয়স হ'ল ক্ষুদের। মাথায় বেড়ে উঠেছে তরতর করে, কিন্তু মাংস নেই শরীরে। একেবারে তালপাতার সেপাইটি। অথচ লেখাপড়ায় দারুণ। বরাবর ফার্স্ট হয়ে এসেছে, ফাইন্যালে নিশ্চিত স্কলার-শিপ পাবে। কিন্তু কুড়ি গজ ছুটতে গেলেই হাঁপ ধ'রে

যায় তার। দুটো ইঁটও তুলতে পারে না একসঙ্গে। মা-বাবা-জেঠুর এই নিয়ে আক্ষেপের আর অন্ত নেই।

সরকারি বুকুনমামা আসেন মাঝে মাঝে ওদের বাড়িতে। গায়ে লম্বা ঝলঝলে আলখাল্লার মতো কোট, মুখে কাঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, গোঁফ, চোখে হাই-পাওয়ার চশমা। জেটপ্লেনের মতো অনবরত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়েন।

সেদিন চা-জল খাবার খেতে খেতে বুকুনমামা বলেন, —"হ্যাঁরে ক্ষুদে, তোদের স্কুলের এ্যানুয়াল স্পোর্টস তো এসে গেছে।

"হ্যাঁ, বুকুনমামা।"

"তোদের স্কুলের স্পোর্টসে তো ভালো ভালো প্রাইজ দেয়?"

"হ্যাঁ বুকুনমামা, ফ্লাস্ক, সুটকেস, ব্যাগ, মেডেল, কাপ কতো কি।"

"তুই নাম দিয়েছিস স্পোর্টসে?"

"আমি?" ম্লান মুখে ক্ষুদে বলে,—"না বুকুনমামা—"

গম্ভীর হয়ে যান বুকুনমামা, দাড়ি চুলকোতে থাকেন, তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে কাছে পিঠে কেউ নেই দেখে বলেন,—"একটা এক্সপেরিমেন্ট করে দেখবি নিজের ওপর? সাংঘাতিক, কি গামা পালোয়ানের চেয়েও অনেক বেশী জোর হবে গায়ে, কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বলিস না এখন।"

বুকুনমামার অধিক ফলন-শীল ডিমের এক্সপেরিমেন্টের কথা এ বাড়ির সবাই জানে, তাই কৌতূহলী হয়ে ক্ষুদে বলে,—"না, বলব না, কি এক্সপেরিমেন্ট্ বুকুনমামা?"

"আমার এক ছাত্র আমেরিকার বার্কলে ইউনিভার্সিটির রসায়নের ডক্টরেট—" চুরুটে লম্বা টান দিয়ে বুকুনমামা বলেন, "সে ওখানেই গবেষণা করছে। একটা ইনজেকশন আবিষ্কার করেছে, একটা এ্যাম্পিউল পাঠিয়েছে আমার কাছে। ওটা মাস্‌লে পুশ করলেই যা ফল হবে না, দেশ সুদ্ধু লোকের তাক লেগে যাবে। এতে আছে রি-কমবিন্যাণ্ট্ ডি. এন. এ. আর রিবোসোমের নির্যাস। এটা নিলে শরীরের কোষে যতো ডি. এন. এ. আছে, তাতে আসে একটা বিপুল পরিবর্তন। ফলে একই দেহে ম্যারাথন রেস বিজয়ী এমল জাটোপেক বা আবেরে-বিকিলা, ওলিম্পিক চ্যাম্পিয়ান জে. সি. ওয়েন্স কিংবা সাঁতারে বিশ্ব রেকর্ডকারিণী, সাতটি-স্বর্ণ পদক বিজয়িনী—শ্যেন গোল্ড্ অথবা ফুটবল-সম্রাট পেলের ক্ষমতা এসে যাবে।"

ক্লাসের আর পাড়ার ছেলেদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ, হাসি-ঠাট্টা মা-বাবা-জেঠুর আক্ষেপ, সব কিছু এক সঙ্গে ভিড় করে আসে ক্ষুদের মনে। চোখ দুটো এক অজানা দীপ্তিতে জ্বলতে থাকে, চেঁচিয়ে বলে ওঠে, "দিন, দিন ইনজেকশন এ্যাম্পিউলটা আমাকে। আমি আজই ইনজেকশন নেব।"

ক্ষুদের মা চা নিয়ে আসছিলেন, বললেন, "কিসের ইনজেকশন বুকুনমামা?"

ধরা পড়ে আমতা আমতা করে বুকুনমামা বললেন,—"ঐ, আমার ছাত্র ডক্টর মনীশ সান্যাল যেটা বার্কলে থেকে পাঠিয়েছে আমাকে। সুপার-পাওয়ার ইনজেকশন।"

বড় জেঠুও এসে পড়লেন, বলেন, "সে আবার কি বুকুনমামা?"

বুকুনমামা তাঁর আলখাল্লার মতো কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা ছোট্ট এ্যাম্পিউল বার করলেন। সপ্ত সমুদ্রের নীল যেন জমাট বেঁধে আছে ভেতরের তরল পদার্থটুকুর ভেতরে, বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার ভেতর থেকে রক্তিম ছটা। ওটা তুলে ধরে বুকুনমামা বলেন,—"এই সেই সুপার পাওয়ার ইনজেকশন, রকফেলার বৃত্তি পাওয়া আমার ছাত্র মনীশের যুগান্তকারী আবিষ্কার। পৃথিবীর দশম আশ্চর্য।"

বড় জেঠু বলেন,—"কোনো রি-এ্যাক্শান, মানে প্রতিক্রিয়া হবে না ওটা নিলে?"

"প্রতিক্রিয়া? হ্যাঁ, তা হবে, তবে তা ভালো প্রতিক্রিয়া। বাইরে থেকে শরীরের কোনো পরিবর্তন দেখা যাবে না, কিন্তু ভেতরে আসবে বিপুল পরিবর্তন। শরীরের সুপ্ত স্ট্রেন্থয়েড গ্ল্যাণ্ড্ ভীষণ ভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবে। ফলে সাহস, স্ট্যামিনা, আর শারীরিক শক্তি সব কিছুই বিশ থেকে পঁচিশ গুণ বেড়ে যাবে। রোগাপটকা ছেলেও অনায়াসে খেলাধূলায় বিশ্ব রেকর্ড করতে পারবে।"

ক্ষুদের দুই চক্ষু অস্বাভাবিক দীপ্তিতে জ্বলে ওঠে, অধীর কণ্ঠে বলে, "এক্ষুনি,—এক্ষুনি—আমাকে ঐ ইনজেকশন দিন বুকুনমামা—"

ওকে মৃদু ধমক দিয়ে ক্ষুদের মা বলেন,—"ওভাবে লাফিয়ে উঠো না ক্ষুদে।" তার পর বুকুনমামার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন—"পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে এর গুণাগুণ?"

"হ্যাঁ, তা হয়েছে, তবে মানুষের ওপরে নয়, ইঁদুরের ওপরে। দিন সাতেক ধরে ঝিম্ মেরে ছিল ইঁদুরটা খাঁচার ভেতরে, তার পরেই একেবারে সিংহমূর্তি।"

ক্ষুদের জেঠু বলে ওঠেন,—"সিংহমূর্তি?"

"হ্যাঁ, খাঁচার এক ইঞ্চি মোটা লোহার রড দাঁত দিয়ে কেটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল ইঁদুরটা। সামনেই পড়েছিল ইয়া তাগড়া এক বেড়াল, ইঁদুর দেখেই তেড়ে এলো, তারপরেই ব্যাস—"

ক্ষুদের মা ব'লে ওঠেন—"ব্যাস মানে? ইঁদুরের

পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ?"

"না, না, বেড়ালের—"

জেঠু আর মা সমস্বরে বলে ওঠেন, "বেড়ালের ? সে কি ?"

"হ্যাঁ, বেড়ালের ঘাড়টি মটকে দিয়ে, দুটো বুলডগকে জখম করে উধাও হয়ে গেল ইঁদুরটা। আমেরিকার সব খবরের কাগজেই ছাপা হয়েছিল খবরটা।"

বুলডগকে ঘায়েল করেছে সামান্য একটা ইঁদুর। বিস্ময়ে চোখ গোল হয়ে যায় ক্ষুদের, ক্ষুদের মা আর ক্ষুদের জেঠুর চোখ। জেঠু বার বার তাঁর চশমা মুছতে থাকেন।

"কিছুদিন পরেই খবর ছাপা হ'ল যে আমেরিকার ন্যাশন্যাল পার্কে হিংস্র পুমা আর একটা ইঁদুরের ভেতর জোর লড়াই হয়েছে, বিরাট হিংস্র পুমাটি মারা গেছে।"

কারুর মুখে আর বাক্যি সরে না।

আর একটা চুরুট ধরিয়ে বুকুনমামা বলেন,—"মনীশ এই এ্যামপিউলটা পাঠিয়েছে ভারতীয় ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখবার জন্য। তবে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষের ওপর এর ফলাফল পরীক্ষা করে দেখা হয় নি। কিন্তু আমার বিশ্বাস এই ইনজেকশন যে নেবে তার লাভ বই ক্ষতি হবে না, শরীরে আসবে ভীম আর হারকিউলিসের সম্মিলিত শক্তি, সে সব ওয়ার্লড্ রেকর্ড ভেঙ্গে ফেলবে।"

"আমি নেব, আমি নেব ঐ ইনজেকশন্—" চেঁচিয়ে ওঠে ক্ষুদে।

"না না—" ওর মা হাত চেপে ধরে বলেন,—"বলা তো যায় না, হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। দরকার নেই বাবা—"

শুধু ক্ষুদের বড় জেঠু বলেন,—"কিন্তু শিবানী, নো রিস্ক্, নো গেইন।" ক্ষুদে হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'বীর পুরুষ' কবিতার খোকার মতো বীর হবে।"

"কী দরকার আমাদের রিস্ক্ নেবার বড়দা ?"

"ঠিক কথা। কী দরকার ?" বলে বুকুনমামা ইনজেকশনের এ্যামপিউলটা পকেটে পোরেন,—"রিকম্বিনাণ্ট ডি. এন. এ. সম্পর্কে কতটুকুই বা জানি আমরা ?"

আর এক প্রস্থ চা-স্যাণ্ডুইচ খেয়ে বিদায় নেন বুকুনমামা।

পরদিন স্কুলে যাবার আগেই বুকুনমামার একডালিয়া রোডের বাড়িতে গেল ক্ষুদে। বুকুনমামা তখন বাথরুমে, মামী রান্নাঘরে। সেই আলখাল্লা মার্কা কোটটা আলনা থেকে ঝুলছিল। এদিক ওদিক তাকিয়ে চট করে তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে সুপার-পাওয়ার ইনজেকশনের এ্যামপিউলটা বার করে আনল ক্ষুদে, নিজের প্যাণ্টের পকেটে পুরল, তারপর চুপি সাড়ে একেবারে রাস্তায়। তখন তার বুকের ধকধক শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল সে।

ডাক্তারখানার কমপাউণ্ডারবাবু ক্ষুদের খুব চেনা। তিনিই দরকার হলে ক্ষুদেকে ইনজেকশন দেন, ওষুধ দেন। ক্ষুদেকে দেখেই হেসে বলেন,—"এই যে ক্ষুদে, এখানে যে ? স্কুলে যাবে না ?"

"এবারে যাবো সুবলদা—আগে এই ইনজেকশনটা নিয়ে নিই,—" বলে ইনজেকশন-এ্যামপিউলটা পকেট থেকে বার করে ক্ষুদে।

"কই দেখি—" বলে ইনজেকশনটা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন সুবল বাবু, বললেন,—"রিকম্বিনাণ্ট ডি, এন, এ, মেড ইন ইউ, এস, এ। এটা কার প্রেসক্রিপশন ক্ষুদে ?"

"আমার শরীরটা কিছুতেই সারছে না দেখে বুকুনমামার এক ডক্টরেট ছাত্র পাঠিয়েছেন বার্কলে ইউনিভার্সিটি থেকে।"

বুকুনমামাকে এ তল্লাটে-সবাই চেনে, তাই আর আপত্তি করেন না সুবল কমপাউণ্ডার। ক্ষুদেকে চেয়ারে বসিয়ে তার ডান হাতে ইন্টার মাসকিউলার ইনজেকশন দিয়ে দেন।

ক্ষুদের মনে হ'ল যে ফুটন্ত সীসা যেন হাতের ভেতরে ঢুকে দ্রুত বেগে শরীরের অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে পড়ছে। ওর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, সারা শরীর অবসন্ন হ'য়ে গেল, দু' চোখে ঘনিয়ে এলো নিবিড় নিশীথ অন্ধকার। শরীরের ভেতরে যেন ভূমিকম্পের মতো সব কিছু ভেঙ্গে চুরে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছিল।

ক্ষুদের মুখ চোখের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা বেঞ্চির ওপর তাকে শুইয়ে দেন সুবল বাবু, আমেরিকান ইনজেকশনের এমন সাংঘাতিক রি-অ্যাকশ্যান হ'তে দেখে ভীষণ ঘাবড়ে যান। ডাক্তার বাবুও ছিলেন না চেম্বারে। কোথায় কোন্ রুগী দেখতে গিয়েছিলেন। অগত্যা একটা রিক্সা ডেকে, খালি এম-পিউলটা হাতে নিয়ে, অর্ধ-অচেতন ক্ষুদেকে তার বাড়ি পৌঁছে দেন সুবলবাবু।

খবর পেয়ে ছুটে এসে ক্ষুদের মা বলেন, "কী, কী হয়েছে সুবলবাবু ? কোথায় এ্যাক্সিডেণ্ট্ হ'ল ?" তাঁর কণ্ঠস্বর থেকে গভীর উদ্বেগ ঝড়ে পড়ছিল।

"না না, কোনো এ্যাক্সিডেন্ট্ নয়, ইয়ে···মানে, এই আমেরিকান ইনজেকশনটা দেবার পরেই একেবারে নেতিয়ে পড়ল ক্ষুদে।"

"আমেরিকান ইনজেকশন? কই দেখি দেখি—" বলে ইনজেকশনটা সুবল বাবুর হাত থেকে এক রকম ছিনিয়েই নিলেন ক্ষুদের মা,—আঁৎকে উঠে বলেন,—"হা ভগবান। এই ইনজেকশনটা নিয়েছে ক্ষুদে? এটা যে কোনো মানুষের ওপর পরীক্ষা করেই দেখা হয় নি এখনো। কী—হবে এখন? যাই, ওঁকে ফোন করি কোর্টে, আপনি ততক্ষণ একজন ডাক্তার ডেকে আনুন তাড়াতাড়ি।"

অপ্রতিভ মুখে ছুটে বেরিয়ে যান সুবল কম্পাউণ্ডার।

ক্ষুদের বাড়িতে হৈ চৈ পড়ে যায়। কিছুক্ষণের ভেতরেই ডাক্তার বিশ্বাস এসে পড়েন। ক্ষুদের নাড়ি দেখলেন, স্টেথো দিয়ে বুক পিঠ সব দেখলেন, ম্যানো মিটার দিয়ে রক্তের চাপ দেখলেন, তারপর ক্ষুদের বাবাকে বললেন,—"সব তো ঠিকই আছে দেখছি, অবশ্য রক্তের চাপ বেশী,—পাল্‌সও র‍্যাপিড, তবে ভয়ের কিছু নেই।' পরিপূর্ণ বিশ্রাম দরকার। এই প্রেসক্রিপশনটা নিন, দিনে তিন বার খাওয়াবেন।" ডাক্তার বিশ্বাস এম. আর. সি. পি. তবু তাঁকে বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল।

পাক্কা তিনদিন ঐ রকম অর্ধ-অচেতন অবস্থায় কেটে যায় ক্ষুদের। সোমবার ভোরবেলা চোখ খোলে সে। মুখের ওপর ঝুঁকে থাকা—উদ্বেগ-আকুল মাকে দেখে একটু হাসে, শরীরে মোড়ামুড়ি দিয়ে বেশ জোরালো গলায় বলে, "জল খাবো মা।"

দারুণ খুশী হ'য়ে এক ছুটে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টিলের গ্লাসে জল নিয়ে আসেন ক্ষুদের মা, পেছনে পেছনে আসেন ক্ষুদের বাবা, বড় জেঠু, দাদা আর দিদি।

ঝপ্ করে বিছানায় উঠে বসে ক্ষুদে, সেগুন কাঠের খাট আর্তনাদ ক'রে ওঠে। চৌ চৌ করে জল খেয়ে মা-র হাতে স্টেন্‌লেস স্টিলের গ্লাস ফিরিয়ে দেয়, মট্ ক'রে একটা জোর শব্দ হ'য়। অবাক হয়ে মা-বাবা-জেঠু দেখেন যে অমন শক্ত স্টিলের গ্লাসটা তুবড়ে গেছে, প্রায় ভাঙ্গারই সামিল।

দেখে ক্ষুদেও কম অবাক হয় না, হয়তো আঙ্গুলের চাপ একটু বেশীই হয়ে গিয়েছিল, তাই ব'লে অমন মজবুত স্টিলের গ্লাস ভাঙ্গবে? তবে কি,—তবে কি এটা ঐ আমেরিকান ইনজেক্‌শনের গুণ?

"জয় বুকুনমামা, জয় বুকুনমামা।" মনে মনে বলে সে।

তড়াক ক'রে মেঝেতে নামে সে, মাথার দিকের জানালাটা খোলা যায় না শত চেষ্টাতেও। বন্ধই ছিল। হ্যাঁচকা টানে জানালাটা খুলে দেয় ক্ষুদে, একটা পাল্লা কব্জা ভেঙ্গে ক্ষুদের হাতে চলে আসে। অমন ভারি জানালাটা শোলার মতো হালকা ঠেকে তার কাছে।

ক্ষুদের মা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, ব্যাপার দেখে দু'চোখ ছানাবড়া হয়ে যায় তার মা-বাবা-জেঠু-দাদা-দিদির। সেই দুর্বল ল্যাগবেগে ক্ষুদের হাতের টানে কিনা একটা আস্ত জানালা ভেঙ্গে চলে এলো! বড় জেঠু মাথা নাড়তে থাকেন,—"শিবানী, সুপার-পাওয়ার ইনজেক্‌শন তা হ'লে গাল গল্প নয়!"

ক্ষুদের বাবা বলেন,—"খুব সাবধান ক্ষুদে। তোর শরীরে এখন ভীম আর হারকিউলিসের সম্মিলিত শক্তি। কাজেই খুব সাবধানে বাড়ির জিনিসপত্র নাড়াচাড়া করবি। নইলে সব কিছু ভেঙ্গেচুরে তছনছ হ'য়ে যাবে একেবারে।"

উৎসাহ-দীপ্ত মুখে ক্ষুদে বলে,—"তাই হবে বাবা।"

তবু হাতমুখ ধুয়ে খুব সাবধানে নিজের চেয়ারে বসতে গিয়েও একটা পায়া মট্ ক'রে ভেঙ্গে ফেলে ক্ষুদে। ফ্যানের রেগুলেটার অ্যাডজাস্ট করতে গিয়ে নবটাই ভেঙ্গে ফেলে। অতিশয় সন্তর্পণে চা-জল খাবার খেতে গিয়েও স্টিলের কাপ-প্লেট দু'টুকরো করে ফেলে। জামা গায়ে দিতে গিয়ে স্ট্রেচলন শার্ট ছিঁড়ে ফর্দাফাই। গোদরেজ আলমারি খুলতে গিয়ে তার হাতলটাই ক্ষুদের হাতে চলে আসে। রেগে গিয়ে দুম করে কিল মেরে পনেরো ইঞ্চি দেওয়ালে ফাটল ধরায়।

অথচ তার শরীর আগে যেমন রোগা-পটকা ছিল, এখনও তা-ই আছে, তবু কিন্তু শিরায় শিরায়, রক্তের ধ্বনিতে প্রবল শক্তির অস্তিত্ব অনুভব করছিল ক্ষুদে। পরীক্ষা করে দেখবার জন্য জানালার এক ইঞ্চি মোটা লোহার রড অনায়াসে বাঁকিয়ে ফেলে সে। তার মা-বাবা-জেঠু-দাদা-দিদি বিস্ময়ে এতই হতবাক হয়ে যান যে তাঁদের মুখ দিয়ে আর কোনো কথা সরে না।

শেষে মাথা নাড়তে নাড়তে ক্ষুদের বড় জেঠু বলেন,—"যাই, আমি বুকুনমামাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়ে আসি। এ কয় দিন ধরে ওকে খুব গালমন্দ করেছি সবাই মিলে।"

পাড়াতেই ভবানী ঘোষের বিরাট ব্যায়ামাগার। পায়ে পায়ে সেখানে পৌঁছে যায় ক্ষুদে। আট-দশটি ছেলে ব্যায়াম করছিল সেখানে। কী বলদৃপ্ত, ব্যায়ামপুষ্ট পেশী-

বহুল শরীর ওদের !

ওরা করছিল রিং, প্যারালাল-বার, বীম-ব্যালান্স, ল্যাডার, মুগুর ভাঁজা, বারবেল, আরও কতো কী। চারটি মেয়ে যোগ-আসন করছিল।

ক্ষুদেকে দেখে এগিয়ে আসেন প্রাক্তন ভারত-শ্রী ভবানী ঘোষ। বলেন,—"কী ল্যাগব্যাগ সিং, করবে নাকি একটু একসারসাইস ?"

ছেলেরা সব হো হো করে হেসে ওঠে, মেয়েরাও। রাণা বলে,—"ল্যাগ্‌ব্যাগ সিং করবে এক্সসারসাইজ ? তা হলেই হ'য়েছে ! ও তো একসঙ্গে দুটো ইঁটও তুলতে পারে না !"

সুদর্শন ফোড়ন কাটে—"আহা, বাধা দিচ্ছিস কেন ? করুকই না একটু,—শখ হ'য়েছে যখন।"

কাকলী কলকল ক'রে ওঠে,—"এ তোমার রাত জেগে পড়া মুখস্থ করা নয়, বুঝলে ল্যাগ্‌ব্যাগ সিং ?"

ক্ষুদে কিন্তু অন্য দিনের মতো রেগে কাঁই হয় না। পার্থ ভারি বারবেলটা তুলতে গিয়ে হিমসিম খাচ্ছিল, আড়চোখে দেখে। তারপর চট্‌ করে প্যারালাল বারে উঠে নিখুঁত পিকক করে দেখায় সবাইকে। ভল্টিং হর্সে ডবল ভল্ট খায়, যা মেয়েদের স্কুল স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ন সনু আর ঝুমকুও পারে না।

ছেলেমেয়েদের হাসি-ঠাট্টা পলকে স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বয়ং ভবানী ঘোষও অবাক। চোখ কচলে বলেন, "আমি স্বপ্ন দেখছি না তো রে ক্ষুদে ! তুই-তুই,—এই রোগা-পটকা শরীর নিয়ে প্যারালাল-বারে চমৎকার পিকক করলি, ভল্টিং হর্সে নিখুঁত ডবল ভল্ট খেলি ! তাও বিনা প্রাকটিশে।"

তিনি আমেরিকা, জার্মেনী, রাশিয়া, চীন, জাপান ঘুরে এসেছেন, কিন্তু এরকম অসম্ভব ব্যাপার কোথাও দেখেন নি।

ক্ষুদে কোনো জবাব দেয় না। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পার্থর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, বলে,—"কিরে, জুনিয়ার গ্রুপ ওয়েট্‌ লিফটিং চ্যাম্পিয়ান ইন বেঙ্গল, পারছিস না বারবেলটা তুলতে ?"

ঘেমে নেয়ে গেছে পার্থ, কিন্তু বারবেলটা ন্যাচে হাঁটুর ওপরে তুলতে পারেনি। কটমট করে তাকায় ক্ষুদের দিকে, বলে,—তুই পারবি ?"

ওর কথায় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আর তীক্ষ্ণ শ্লেষ লুকিয়ে ছিল।

ক্ষুদে ভবানী ঘোষের মুখের দিকে তাকায়, "ভবান'দা, কত ওজন আছে বারবেলটাতে ?"

"একটু বেশীই আছে রে ক্ষুদে। একশ ষাট কেজি। বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ান শিপের জার্কিং-এ এর চেয়ে অনেক বেশীই তুলেছেন রাশিয়ান এ্যাথলিট। ভারতে এটাই ম্যাক্সিমাম। ভেবেছিলাম পার্থটা পারবে. কিন্তু..."

"আমি তুলব ভবানী দা ?"

"তুই !! উল্টে পড়ে যাবি-রে। দাঁড়া, আমি বারবেলের ওজন কমিয়ে দশ কিলো করে দিচ্ছি—"

"না না, একশ' ষাট কিলোই তুলব আমি—" জেদ ধরে ক্ষুদে, সরিয়ে দেবার জন্য মৃদু ধাক্কা দেয় পার্থকে, তাতেই পার্থের মতো জোয়ান ছোকরা উল্টে পড়ে যায়।

বারবেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ায় ক্ষুদে।

হাঁ হাঁ করে ছুটে আসেন ভবানী ঘোষ, "মাথা খারাপ। থাম থাম। এই ক্ষুদে, কী করছিস ?"

কিন্তু পরক্ষণেই ভবানী ঘোষ, পার্থ, রাণা, সুদর্শন, ঝুমা, বাবুয়া, মনু. ঝুমকু, কাকলী, জয়া সবাই হাঁ হয়ে যায়। সে হাঁ আর বন্ধই হতে চায় না সহজে। কারণ বাঁ হাতেই একশ' ষাট কিলো ওজনের দারুণ ভারি বারবেলটা এক ঝটকায় অনায়াসে মাথার ওপর তুলে ফেলেছিল ক্ষুদে।

অবাক, অবাক ঐ তালপাতার সেপাই. ল্যাগ্‌ব্যাগ সিং কিনা ভারতের শ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলনকারী হয়ে গেল। হয়তো বিশ্বেরও।

মাটি কাঁপিয়ে স্কুলে যাবার পথে কি করে একটা ক্ষ্যাপা ষাঁড়কে শিং ধরে বাগে আনল সে কথা আর এখানে বলছি না। কিন্তু প্রথম ধাক্কা খেল পি. টি. স্যারের কাছে। এত সব করেও পি. টি. স্যার কিছুতেই স্কুল স্পোর্টসে ক্ষুদের নাম দিতে চাইলেন না, বলেন,—"তা কি করে হয় ল্যাগ্‌ব্যাগ সিং, তুই ইন্টার স্পোর্টসে নাম দিবি কি। তা-ও আবার সব ইভেন্টে। একটা অঘটন ঘটলে তোর বাবা আমাকে আস্ত রাখবেন না। যা, ভাগ। চেষ্টা কর স্কুল ফাইন্যালে ফার্স্ট টু ফোর্থের মধ্যে হতে।"

সব রকম আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হ'ল। তবু ক্ষুদে নাছোড়বান্দা,—বলে. "আচ্ছা, অন্ততঃ হিটে নাম দিয়েই দেখুন না স্যার। যদি না পারি তা হলে তো আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবো।"

হাত নেড়ে পি টি স্যার বলেন,—"কেন মিছি মিছি লোক হাসাতে চাস ক্ষুদে ? মুখ থুবড়ে পড়ে যাবি, সবাই তখন আমাকেই দুষবে। যা, যা, বাড়ি যা—"

অন্য প্রতিযোগীরাও খুব হাসছিল ক্ষুদের আবেদন নিবেদন শুনে—হাসি টিটকিরি ছুঁড়ে দিচ্ছিল,—ওরে ল্যাগ-ব্যাগ সিংও স্পোর্টসে নাম দেবে রে,—হিঃ হিঃ, খিঃ খিঃ—"

অনেকক্ষণ ধরে খুব অনুনয়-বিনয় করে ক্ষুদে। হাজার হোক স্কুলের ফার্স্ট-বয়, তাই শেষ পর্যন্ত পি টি স্যারের মন একটু নরম হয়, কিঞ্চিৎ সদয় কণ্ঠে বলেন, —"আচ্ছাঃ একটা পরীক্ষা দে আগে, যদি পাশ করতে পারিস তাহ'লে চান্স দেব তোকে—"

ক্ষুদে তো তক্ষুনি-রাজি, বলে, "কী পরীক্ষা স্যার? দৌড়ের?"

"না, ফুটবল কিক-এর। পুন্টু,—এই ফুটবলটা গোল পোস্টের সামনে রাখ, ক্ষুদে কিক্ করবে, দেখি, কতদূর যায়।"

ফুটবলটা হাতে তুলে নিয়ে স্কুল-ইলেভেনের স্টপার পুন্টু বলে, "কতদূর আর যাবে স্যার? বড় জোর দশ গজ,—"ব'লে ফুটবলটা প্লেস করে নির্দিষ্ট জায়গায়।

ক্ষুদে মুখে কিছু বলে না, পোজিশন নিয়ে দুম্ করে ফুটবলে জোরে কিক্ করে। সঙ্গে সঙ্গে ফুটবলটা বুলেটের মত শাঁ শাঁ করে শূন্যে উঠে যায়, ছোট হ'তে হ'তে অদৃশ্য হয়ে যায়, একমাঠ ছেলের চোখের সামনে। হতভম্ব হয়ে যায় পুন্টু, মিঞা, বাপি, টুম্পা, সিদ্ধার্থ, খোকা। ওরা সবাই সাউথ স্কুল-ইলেভেনের বাছাই করা প্লেয়ার।

পি. টি. স্যার সুরেশ সামন্ত নিজেও এককালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলেছেন, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছিলেন না ব্যাপারটা। এ ধরনের কিক্ তো পেলে কি ইউসুবিওর দ্বারাও সম্ভব নয়।

আর কথাটি না বলে খাতা বার করে বলেন,—"হিট তোকে দিতে হবে না ক্ষুদে, কোন্ কোন্ ইনভেন্টে নাম দিতে চাস বল।"

ক্ষুদে বলে,—"সবগুলো ইভেন্টেই স্যার।"

আর কথা না বাড়িয়ে ইন্টার-স্কুল স্পোর্টস-এর সব-গুলো ইভেন্টেই ক্ষুদের নাম লিখে নেন পি. টি. স্যার। বলেন, "মনে রাখিস, সামনের সোমবারেই ফাইন্যাল।"

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই সোমবার। স্কুলের বিশাল স্পোর্টস-গ্রাউণ্ড লোকে লোকারণ্য। আশেপাশের দু'তিনটে স্কুলের ছেলেরাও এসেছে স্পোর্টস্-গ্রাউণ্ডে ল্যাগব্যাগ সিং-এর তামাশা দেখতে। ফুটবল কিকের গপ্পটা ওরা স্রেফ্ গুল বলে উড়িয়ে দিয়েছে। তবু ওদের মা-বাবা-দাদা-দিদিরা এসেছেন কৌতূহলী হয়ে।

বিখ্যাত দৌড়বীর মিলখা সিং প্রধান অতিথি এবং ওলিম্পিক কমিটির চেয়ারম্যান সভাপতির আসনে বসা-মাত্র ইন্টার স্কুল-স্পোর্টস শুরু হয়ে যায়।

ক্ষুদে কিন্তু নির্বিকার। অন্য সবাই রেডি।

"রেডি" পি টি স্যার হাঁক দেন।

সবাই পোজিশন নেয়, গুড়ুম করে পিস্তলের আওয়াজ হয়, সঙ্গে সঙ্গে মাঠের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত যেন একটা বুলেট ছুটে যায়, অন্য সব প্রতিযোগীকে আধ মাঠ পেছনে ফেলে সাড়ে সাত সেকেণ্ডে বিশ্ব-রেকর্ড ভেঙে লাল ফিতে ছোঁয় ক্ষুদে। অবাক, অত জোরে ছুটেও একটুও হাঁপাচ্ছিল না সে। হাসিমুখে ভিক্টরি স্ট্যাণ্ডের সর্বোচ্চ শিখরে দাঁড়ায়।

মাঠ ময় নিরুদ্ধ-নিশ্বাস স্তব্ধতা। সবার চোখের সামনে যেন ভোজবাজী ঘটে গেল। এও কি সম্ভব? ঐ রোগা পটকা ছেলেটা, যে হয়তো এক ফুয়ে উড়ে যাবে, সে-ই কিনা অনায়াসে বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ ক'রে বিশ্বের ক্ষিপ্রতম ব্যক্তি হয়ে গেল!

কিন্তু সে মুহূর্তমাত্র, পর মুহূর্তেই বিশাল জন-সমুদ্র ক্ষুদের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলল,—সে আওয়াজ ট্রাম-বাস-কার, জেটপ্লেনের শব্দ ছাড়িয়ে দূরে দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। মিলখা সিং ছুটে এসে ক্ষুদেকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এক ঝুড়ি অভিনন্দন জানালেন, তারপর ফিরে গিয়ে ওলিম্পিক কমিটির প্রেসিডেন্টকে মৃদু স্বরে কী-যেন বললেন। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তিনি ক্ষুদের নাম ডায়েরীতে টুকে নিলেন।

এরপর শুধু অপ্রত্যাশিত ঘটনাই ঘটতে লাগল, ইন্টার-স্কুল স্পোর্টস-এর প্রত্যেকটি ইভেন্টে বিশ্ব-রেকর্ড ভঙ্গ করে একগাদা কাপ, শীল্ড, মেডেল, ইউটিলিটি গুডস্ প্রাইজ পেয়ে মা-কে বাবাকে, জেঠুকে দাদা-দিদিকে আর বুকুন মামাকে প্রণাম করে ক্ষুদে। বুকুনমামার জন্যই তো তার আজকের যতো সাফল্য?

ভবানী ঘোষ এসে ক্ষুদের পিঠ চাপড়ে দেন, বলেন, "আজ থেকে তুই আমার জিমনাশিয়ামের আজীবন সদস্য ক্ষুদে। ওয়েট লিফ্টিংএ রাশিয়ার বিশ্ব-রেকর্ড ভাঙতে হবে কিন্তু।"

বুকুনমামা আনন্দে নাচতে থাকেন, বলেন, 'জয় সুপার পাওয়ার ইনজেকশনের জয়!'

সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। ভারত সরকারের সানন্দ অনুমোদনও পাওয়া গেছে। এবারের ওলিম্পিকে ক্ষুদে যাচ্ছে ভারতের হয়ে।

এম. এফ/১৮, সিমুলগ্রাম পোঃ-কুলটি, বর্ধমান; পিন-৭১৩৩৪৩

সূর্যের নিকটতম গ্রহ বুধ

বিমান বসু

শোনা যায় বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ নিকোলাস কোপারনিকাস নাকি মৃত্যুশয্যায় শুয়ে আক্ষেপ করেছিলেন যে জীবনকালে তিনি কখনও বুধগ্রহকে দেখতে পাননি। তোমরা হয়ত শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছো। কিন্তু এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। আসলে গ্রহ হিসাবে বুধ এত ছোট আর সূর্য থেকে এর দূরত্ব এত কম যে আকাশে সে বেশীর ভাগ সময়ই সূর্যের প্রখর তেজের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

বুধের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরে হওয়ার দরুন বুধকে কখনও ভোরে সূর্যোদয়ের ঠিক আগে, কখনও সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের ঠিক পরেই কেবল কিছুক্ষণের জন্যে দেখা সম্ভব। তবে সে সময় যদি আকাশে একটু কুয়াশা, ধোঁয়া, ধুলো বা মেঘ থাকে তাহলে আর বুধের দেখা পাওয়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং বুঝতেই পারছো জ্যোতির্বিদ কোপারনিকাসের কেন বুধকে দেখবার সৌভাগ্য হয় নি।

আগেই বলেছি, গ্রহ হিসেবে বুধের আকার নিতান্তই ছোট। সৌরমণ্ডলের সবচেয়ে ছোট এই গ্রহটির ব্যাস মাত্র ৪৮৮০ কিলোমিটার। যদি তোমরা মনে রাখো যে আমাদের চাঁদের ব্যাস হলো ৩৪৭৬ কিলোমিটার, তাহলেই বুধ যে সত্যিই কত ছোট তার একটা আন্দাজ পেতে পারো।

আকার ছাড়াও, বুধের কক্ষপথ অন্য সব গ্রহের কক্ষপথের চেয়ে ছোট। সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব ৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার থেকে নিয়ে ৬ কোটি ৯৮ লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত কমে বাড়ে। আবার সূর্যের খুবই কাছে আছে বলে কক্ষপথে বুধের গতিবেগও সবচেয়ে বেশী, গড়ে সেকেণ্ডে প্রায় ৪৮ কিলোমিটার। তবে এই গতি সবসময় এক থাকে না। কেপলারের সূত্র অনুসারে গতিবেগ নির্ভর করে সূর্য থেকে আসল দূরত্বের ওপর। বুধের বেলায় দেখা গেছে যে, যখন দূরত্ব সবচেয়ে বেশী, মানে ৬ কোটি ৯৮ লক্ষ কিলোমিটার, তখন কক্ষপথে তার গতিবেগ সবচেয়ে কম, মানে সেকেণ্ডে প্রায় ৩৭ কিলোমিটার। অপর দিকে দূরত্ব যখন সবচেয়ে কম, মানে ৪ কোটি ৬০ লক্ষ কিলোমিটার বুধের গতিবেগ তখন হয় সবচেয়ে বেশী। সেকেণ্ডে সে তখন প্রায় ৫৬ কিলোমিটার এগিয়ে যায়। এই দ্রুতগতির জন্য, অনুকূল পরিবেশ হলেও বুধকে আকাশে খুব কম সময়েই একই জায়গায় দেখা যায়।

পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণের নানা অসুবিধার জন্য দূরবীনের আবিষ্কারের পরেও বুধের বিষয় বেশী কিছু জানা সম্ভব হয়নি। শুধু জানা গিয়েছিল যে চাঁদের মত বুধের গায়েও অবশ্য দাগ আছে। আবার ঐ সব দাগের গতি অধ্যয়ন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন যে বুধ নিজের অক্ষে একবার পাক খায় ৮৮ দিনে। মানে, সূর্যের বক্ষে একবার প্রদক্ষিণ করতে বুধের যত সময়

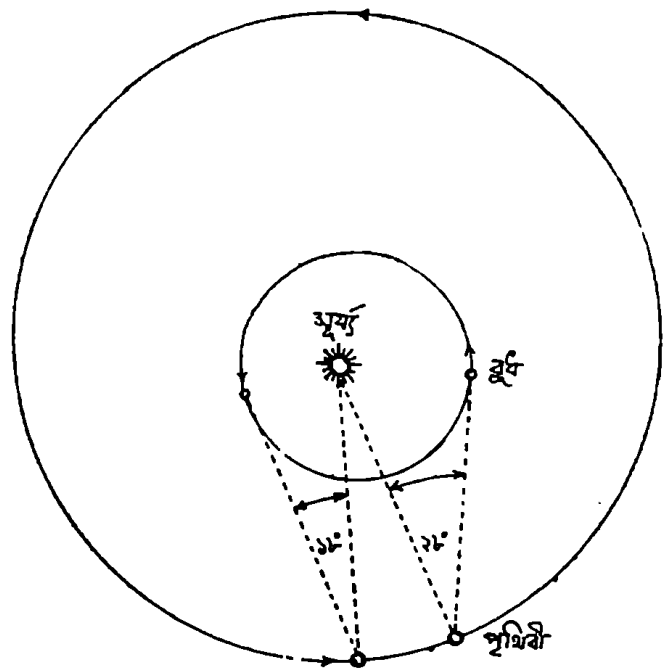

বুধ ও পৃথিবীর কক্ষপথ। বুধ কখনোই সূর্য থেকে ২৮ ডিগ্রীর বেশী দূরে যায় না—তার ফলে বেশীর সময়েই বুধ সূর্যের উজ্জ্বল আলোয় হারিয়ে যায়।

লাগে ঠিক তাই। এর ফলে বৈজ্ঞানিকেরা ভেবেছিলেন আমাদের চাঁদের মত বুধেরও একটাই দিক হয়ত সব সময় সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে। কিন্তু আজ আমরা জানতে পেরেছি যে এসব ধারণাই ছিল ভুল।

১৯৬৫ সালে বিশেষ ধরনের রেডিও সংকেতের

সাহায্যে অধ্যয়নের ফলে জানতে পারা গেল যে আসলে বুধ নিজের অক্ষে একবার পাক খায় মাত্র ৫৯ দিনে। এর মানে হলো এই যে, যে সময় বুধ নিজের অক্ষে তিন পাক খায় সে সময়ের মধ্যে সে সূর্যকে দুবার প্রদক্ষিণ করে আসে। আর এই অদ্ভুত সমন্বয়ের ফলে বুধের ওপর এক 'দিন' এর দৈর্ঘ্য হয় প্রায় আমাদের ১৭৬ দিনের সমান। তাছাড়া বুধের আকাশে সূর্যের গতিও হয় অস্বাভাবিক।

যদি বুধের ওপর সূর্যোদয়ের ঠিক আগে কেউ সেখানে গিয়ে পৌঁছয় তাহলে সে দেখবে যে সূর্য প্রথমে পৃথিবীর মতই পূর্ব দিগন্তে উদয় হবে। কিন্তু উদয় হওয়ার পর কিছুক্ষণ আকাশে স্থির থেকে আবার সে পূর্ব দিগন্তেই অস্ত যাবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার একবার সূর্যোদয় হবে পূর্বদিগন্তে। দ্বিতীয়বার উদয় হওয়ার পর বুধের আকাশে পুব থেকে পশ্চিমে যেতে সূর্যের সময় লাগবে প্রায় ৮৮ দিন, মানে, বুধের এক বছর। তারপর, উদয় হওয়ার মত পশ্চিমে সূর্য অস্তও যাবে দুবার। অর্থাৎ একবার পশ্চিমে অস্ত যাওয়ার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে আবার সূর্যোদয় হবে, তারপর দ্বিতীয় বার অস্ত যাবে। বেশ মজার ব্যাপার, তাই না?

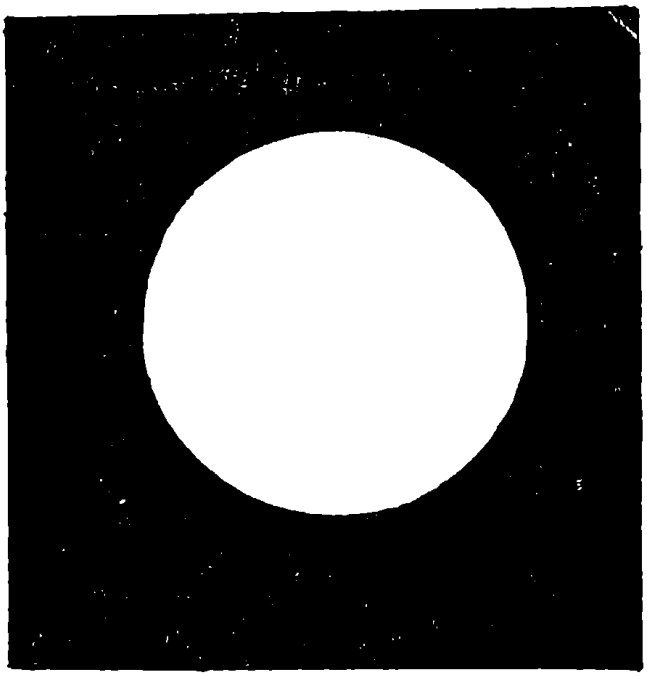

সূর্যের সামনে বুধ গ্রহের সংক্রমণ। ছবিতে ডান পাশের ছোট বিন্দুটাই হল বুধ। বাঁদিকে নীচের দাগগুলো হল সৌরকলঙ্ক।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। এই যে দু-দুবার বুধের আকাশে সূর্যের উদয় ও অস্ত যাওয়া, এটা হয় কেবলমাত্র কক্ষপথে বুধের গতিবেগের কমবেশী হওয়ার দরুন। যার ফলে বুধ যখন সূর্যের সব চেয়ে কাছে আসে তখন বুধের আকাশে সূর্যকে খুব অল্প সময়ের জন্য পশ্চিম থেকে পুব দিকে চলতে দেখা যায়।

সূর্য থেকে কম দূরত্ব আর অত লম্বা 'দিন' হওয়ার দরুন সহজেই অনুমান করা যায় যে বুধের ওপর তাপমাত্রা খুব বেশী হবে। দূরবীনে বিশেষ যন্ত্র লাগিয়ে দেখা গেছে যে বুধের যে দিক সূর্যের দিকে ফেরানো থাকে (মানে যে দিকে দিন) সে দিকের উপরিতলের তাপমান ৪০০ ডিগ্রী সেলসিয়সেরও বেশী। মানে সে উত্তাপে সীসা বা দস্তার মত ধাতু অনায়াসে গলে যাবে। আবার সূর্যের বিপরীত দিকের তলের (মানে যে দিকে রাত) তাপমান পাওয়া গেছে শূন্যেরও প্রায় ১০০ ডিগ্রী নীচে।

বুধের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের ভেতরের দিকে হওয়ার দরুন একটা বিশেষ ঘটনা মাঝে মাঝে দেখা যায় যা অনেকটা আমাদের পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের মত। সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ কালে প্রায়ই বুধ সূর্য এবং পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে। সে সময় যদি সূর্য, বুধ এবং পৃথিবী একই সরল রেখায় থাকে তবে বুধকে সূর্যের চাকতির ওপর ছোট কালো বিন্দুর মত দেখায় যা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সূর্যের গায়ে এক পাশ থেকে অন্য পাশে সরে যেতে দেখা যায়। এই ঘটনাকে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন সংক্রমণ (ইংরাজীতে বলা হয় transit)। যদি পৃথিবী এবং বুধের কক্ষপথ একই সমতলে হতো তবে প্রতি বছরে তিন বার এরকম ঘটনা দেখা যেত। কিন্তু আসলে তা হয় না, কারণ বুধের কক্ষ এবং পৃথিবীর কক্ষ এক সমতলে নেই, আছে ৭ ডিগ্রী কোনাকুনি ভাবে। ফলে সূর্যের সামনে বুধের সংক্রমণ হয় সাধারণতঃ সাত বা তের বছর পরে পরে। আর তাও হয় কেবলমাত্র মে এবং নভেম্বর মাসে। গত ১৯৭৩ সালের ১০ই নভেম্বর বুধের সংক্রমণ দেখা গিয়েছিল। এই শতকে আবার দেখা যাবে ১৩ই নভেম্বর ১৯৮৬, ৬ই নভেম্বর ১৯৯৩ এবং ১৫ই নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে।

এতক্ষণ বুধের বিষয় যা কিছু বললাম তা ছিল কেবলমাত্র পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণের ফলে যা জানতে পারা গেছে সে সব কথা। তবে পৃথিবী থেকে বুধের গঠন সম্বন্ধে কোনও তথ্যই প্রায় পাওয়া যায়নি। সে বিষয়ে প্রথম খবর পাওয়া গিয়েছিল মার্কিন মহাকাশ যান মেরিনার—১০ থেকে। ১৯৭৪ সালে মেরিনার—১০

মহাকাশযান সর্ব প্রথম কাছ থেকে বুধের ছবি তুলে পাঠায়। সে সব ছবিতে দেখা গেল যে বুধের উপরিতল অবিকল আমাদের চাঁদের মত। সেখানেও মাটি অসংখ্য গর্তে ভরা এবড়ো খেবড়ো। আরও রয়েছে পাহাড় আর বিশাল সমতলভূমি। আরও দেখা গেল যে চাঁদের মত বুধেরও এক গোলার্ধ অপেক্ষাকৃত মসৃণ, মানে কম এবড়ো খেবড়ো। বুধের গঠনের বিষয়ও নতুন তথ্য পাওয়া গেল। মেরিনারের পাঠানো তথ্য বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিকেরা অনুমান করলেন যে বুধের বাইরের গঠন চাঁদের মত হলেও তার ভেতরটা ঠিক আমাদের পৃথিবীর মত। এখানে একটা কথা তোমাদের বলে দিই যে সৌর-মণ্ডলে বুধই কেবল একমাত্র গ্রহ যার ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের প্রায় সমান। বুধের ঘনত্ব হলো ৫·৫; পৃথিবীর ৫·৪, চাঁদের ৩·৩।

মেরিনার আরও খবর পাঠালো যে বুধের খুবই হাল্কা বায়ুমণ্ডল আছে যা হিলিয়াম গ্যাসের তৈরী। এছাড়া বুধের নিজস্ব চুম্বকীয় ক্ষেত্রের অস্তিত্বও পাওয়া গেছে, যদিও তা আমাদের পৃথিবীর চুম্বকীয় ক্ষেত্রের তুলনায় খুবই ক্ষীণ। তবে বুধের ঐ চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উৎস কি তা আজও জানা যায়নি।

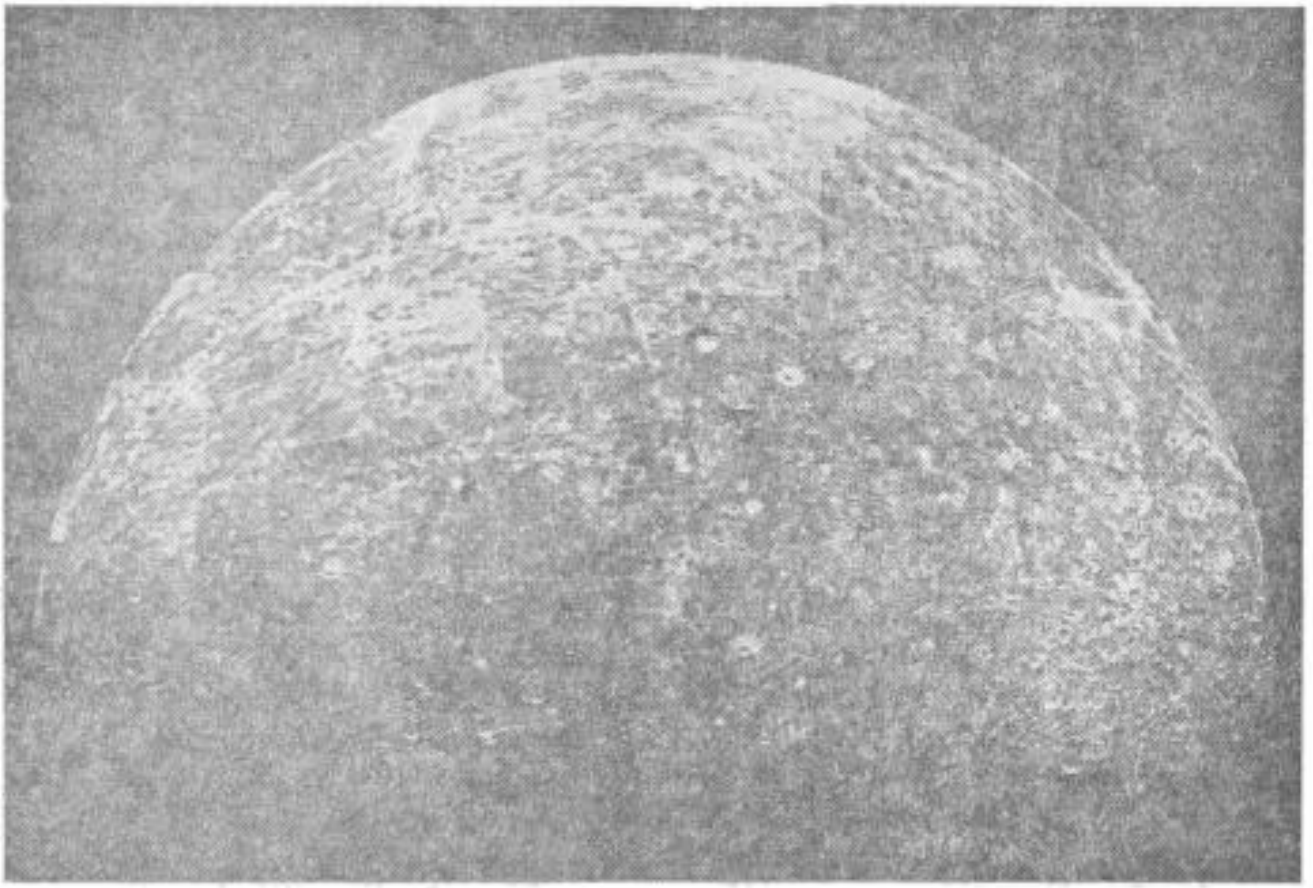

মেরিনার-১০ মহাকাশ যান থেকে তোলা বুধ গ্রহের ছবি। দেখতে ঠিক আমাদের চাঁদের মতো। তাই না?

কিছু বৈজ্ঞানিক মনে করেন যে পৃথিবীর মত বুধের অভ্যন্তরভাগও ভারী লোহার তৈরী আর সেই লোহাই হলো তার চুম্বকীয় ক্ষেত্রের উৎস।

[ক্রমশঃ]

৭, ইউ. এফ. কলেজ রোড
নিউ দিল্লী-১১০০০১

প্রাচীন ভারতের গণিতাচার্য

বরাহমিহির

নন্দলাল মাইতি

প্রাচীন ভারতে বিশুদ্ধ গণিত চর্চার চেয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার দিকেই বেশী ঝোঁক ছিল। গণিত না হলে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা সম্ভব নয়, তাই গণিত চর্চা হতো। প্রাচীন ভারতের প্রায় সব গণিতাচার্যই ছিলেন প্রধানত জ্যোতির্বিদ। আর্যভট তাঁর "আর্যভটীয়" গ্রন্থের বেশীর ভাগ জায়গায় জ্যোতির্বিজ্ঞানের আলোচনাই করেছেন, গণিতের আলোচনা তার চেয়ে কম।

আর্যভটের পর যে গণিতজ্ঞের নাম করতে হয়, তিনি হলেন বরাহমিহির। তিনিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গ্রন্থ রচনা করেছেন, আর এইসব গ্রন্থে গণিতের উপাদান আছে। তাঁর পিতার নাম আদিত্য দাস। তিনি অবন্তী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। আবার কেউ কেউ বলেন তিনি মগধের অধিবাসী ছিলেন এবং পরবর্তীকালে উজ্জয়িনী নগরীতে এসে গ্রন্থাদি রচনা করেন। কপিত্থ নামক স্থানে সূর্যদেবকে সন্তুষ্ট করে নাকি বরলাভ করেন।

বরাহমিহির জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু জৈন ধর্মাবলম্বী আর একজন বরাহমিহিরের নাম পাওয়া যায়। এঁকে ভদ্রবাহুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলে মনে করা হয়। এ-বিষয়ে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে।

শ্বেতাম্বররা বলেন, গোদাবরী নদীর তীরে প্রতিষ্ঠান বা পৈথানা নগরে ভদ্রবাহু ও বরাহমিহির দুভাই ছিলেন। ভদ্রবাহুর গুরু যশোভদ্র শিষ্য ভদ্রবাহু ও সম্ভূতবিজয়কে আচার্যপদে প্রতিষ্ঠিত করায় বরাহমিহির ক্ষোভে ও দুঃখে জৈন ধর্ম ত্যাগ করেন। বরাহমিহির 'বৃহৎসংহিতা' নামে জ্যোতিষশাস্ত্র রচনা করে বিখ্যাত হন। অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে তিনি প্রচার করেন যে, সূর্যদেবের আহ্বানে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ও সব গ্রহ-নক্ষত্র জগৎ দেখে এসেছেন। এইভাবে তিনি বিদর্ভ দেশের রাজার অনুগ্রহ লাভ করেন এবং তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা জৈনদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেন।

জৈনদের এই দুর্দশা দেখে ভদ্রবাহু আর স্থির থাকতে পারলেন না। জ্যোতিষে তাঁর ছিল অলৌকিক প্রতিভা। তিনি বরাহমিহিরকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান জানালেন। যথারীতি বরাহমিহির পরাজিত হলেন, আর ক্ষোভে ও ক্রোধে মারা গেলেন। কিন্তু মরেও তিনি ছাড়লেন না, জৈনদের ঘরে ঘরে নানা রকমের রোগের বীজ ছড়াতে লাগলেন অপদেবতা হয়ে। অপদেবতা তো অনিষ্ট করে।

এই হলো আর এক বরাহমিহিরের কাহিনী। এর মধ্যে কিছু সত্য আছে বলে মনে হয় না। অর্থাৎ আমাদের জ্যোতির্বিজ্ঞানী বরাহমিহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না।

বরাহমিহির আর্যভটের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" 505 খ্রীস্টাব্দের রচনা বলে মনে হয়। এই গ্রন্থে পাঁচখানি জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থের সার সঙ্কলন আছে। এগুলি "পৌলিশ সিদ্ধান্ত", "রোমক সিদ্ধান্ত", "বাশিষ্ঠ সিদ্ধান্ত", "সৌর সিদ্ধান্ত" আর "পিতামহ সিদ্ধান্ত"। "বৃহজ্জাতক" ও "বৃহৎসংহিতা" নামে আরও দুটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছিলেন। এই দুটি গ্রন্থে সময় নির্ধারণ, গ্রহদের অবস্থান, গ্রহণ সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

গণিতবিদ হিসাবে বরাহমিহিরের তেমন নাম নাই। এমন কি জ্যোতির্বিজ্ঞানেও তাঁর কোন নতুন অবদান নাই। তবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁর খুব নাম। আর এই জন্যই আমাদের তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কারণ, তা না হলে তাঁর আগের ও পরের যুগের অনেক গণিতবিদ ও জ্যোতিষীদের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পারতাম না।

তিনি আর্যভটের অনেক মতবাদ স্বীকার করেননি এবং খুব কড়া সমালোচনা করেছিলেন। তা যদি না করতেন, তা হলে খুব ভাল হতো—গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হতে পারত।

বরাহমিহিরকে নিয়ে অনেক গল্প আছে। বলা হয় বরাহমিহির একজনের নাম নয়। পিতার নাম বরাহ ও পুত্রের নাম মিহির। মিহিরের স্ত্রী খনা নাকি বড় জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি খনার বচন রচনা করেন। এ-সব সত্য কিনা কিছু বলা যাবে না। অন্তত জ্যোতির্বিদ বরাহমিহিরের সঙ্গে এ কাহিনীর কোন সম্পর্ক নাই।

পোঃ ঠাকুরানী চক, জেলা হুগলী

খবর পেয়ে যান—কেমন ঝড় আসছে, কি রকম তার ভয়ংকরী রূপ, কোথায়, কতবেগে এই ঝড় আছড়ে পড়তে পারে—এই সব। অবশ্য ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথ একেবারে নিখুঁৎ ভাবে এখনো বলতে পারা যায় না। কেননা সাইক্লোনের গতিপথ আঁকা-বাঁকা হয়। যেমনটা এবার হল। উড়িষ্যার পূর্ব উপকূল ধরে পশ্চিমবঙ্গের কাঁথি ও দীঘায় যে ঝড়ের প্রচণ্ড ভাবে আছড়ে পড়বার কথা, সেই ঝড় সামান্য একটু বাঁক নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ-পরগনাকে ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে একেবারে আসাম পর্যন্ত চলে গেছে। অবশ্য যেতে যেতে তার প্রচণ্ডতা কমে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেছে।'

টুটু বলল, 'কাকু, সাইক্লোন কি ভাবে সমুদ্রে জন্ম নেয় ?'

'এবার সেই কথাই বলছি। আমার আঁকার দিকে দেখ।' সবাই অনির্বাণের হাতের কাগজের উপর ঝুঁকে পড়ে। 'মে-জুন আর অক্টোবর-নভেম্বরে সমুদ্র সাধারণত শান্ত থাকে। এই সময় সমুদ্রের জল রদ্দুরের তাপে উষ্ণ হতে থাকে। গরম হাওয়া জলীয় বাষ্প নিয়ে ১ নম্বর তীরের মত উপরে উঠতে থাকে। কিন্তু উপরের বাতাসে মেঘের মত একটা স্তর তৈরি করে আবার ওই বাষ্প ২-নম্বর তীরের মত গরম বৃষ্টির আকারে নিচে নেমে আসে। এই জলীয় বাষ্প উপরে ঠেলে তুলতে নিচের বাতাসের প্রচণ্ড শক্তির দরকার হয় আর এই শক্তি তাপের আকারে চারিদিকে ছাড়িয়ে পড়তে থাকে। এইভাবে বারেবারে ওঠা নামার ফলে ওই অঞ্চল ভীষণ গরম হয়ে যায় আর খুব তাড়াতাড়ি চওড়ায় বাড়তে থাকে, মাঝখানের জায়গা ভরা থাকে হাল্কা বায়ুতে। এ সময় হাল্কা বায়ু ভরা অঞ্চলটা ভরাট করতে— বায়ুর স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে — ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে যায়—এই যেমন ৩-নম্বর তীর।'

একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে অনির্বাণ আবার বলতে থাকে : 'এই ৩ নম্বর তীরের ঠাণ্ডা বাতাসকে ভিতরে ৪ নম্বর গরম বাতাস তাড়িয়ে দিতে থাকে। এই ক্রমাগত প্রক্রিয়ার ফলে আকাশে মেঘ জমতে থাকে, বাতাসে গুমোট ভাব দেখা দেয়। কেন্দ্রীভূত বাতাসের মাঝখানের চাপ খুব কমে যায়। এর নাম ঝড়ের "চোখ"।

'চোখ ?' সবাই চেঁচিয়ে ওঠে এক সঙ্গে।

একটু হেসে অনির্বাণ বলতে থাকে : 'হ্যাঁ, "চোখ" বা ঝড়ের স্থিতাবস্থা। তিন আর চার নম্বরের বাতাস এভাবে ক্রমাগত প্রক্রিয়া চালাতে থাকলে জমাট বাঁধা বাতাস ৫ নম্বর তীরের মত পূব মুখো ঘুরতে থাকে আর আকারে বড় হতে থাকে। এই ঘূর্ণি বাতাসের ব্যাস ১০০ মাইল থেকে ২৫০ মাইল হতে পারে। আর ঘূর্ণির আবর্তনের গতি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ১৫০ মাইল হওয়া অসম্ভব নয়। এখন এই জমাট বাঁধা বাতাস লাট্টুর মত পাক খেতে খেতে এগোতে থাকে হাজারটা মত্ত হাতির শক্তি নিয়ে। আবহাওয়া বৈজ্ঞানিকরা উপগ্রহ মারফৎ ঝড়ের প্রকৃতি, গতির খবর আগেই জানতে পারেন বলে সবাইকে সতর্ক করে দিতে পারেন। ভাগ্যিস এই ঝড়ের এগিয়ে চলার গতি খুব একটা বেশি নয়। যেমন ধর এবারের ঝড় কলকাতা থেকে প্রায় ২৫০ মাইল দূরে বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিয়েছিল ৫ তারিখে। নিজস্ব আঁকা পথে চলতে চলতে যে দিকে যাবার কথা ছিল সে দিকে না গিয়ে একটু বেঁকে চব্বিশ-পরগনায় এসে পৌঁছাল ১০ তারিখে।'

বাচ্চু বলল, 'সাবধান হবার এত সময় পেয়েও এত মানুষ কিংবা গবাদি পশু মারা যায় কেন ?'

'আসলে কি ব্যাপার জান, এই ধরনের ঘূর্ণি ঝড়তো রোজ-ই হয় না, ষাট বছর কিংবা একশ বছর পরে হয়তো হয়। এর বিধ্বংসী রূপটা মানুষের মনে আঁকা হয়ে থাকে না বলে মানুষকে সতর্ক করে দিলেও আত্মরক্ষা করবার তাগাদা থাকে না। অনেক সময় মানুষ বিশ্বাস-ই করতে চায় না, বিশেষ করে উপকূলের লোকেরা যারা মোটামুটি হাল্কা ঝড়ে কিংবা বড় বড় জোয়ার বা বানে অভ্যস্ত। সতর্কবাণী না শুনলে কি ফল হয় জানো ? একেত ঝড়ের তাণ্ডবে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তার উপর বাতাসের ধাক্কায় সমুদ্রের বিরাট বিরাট ঢেউ কখনো নয় ফিট থেকে চব্বিশ ফিট পর্যন্ত উঁচু হয়ে ডাঙ্গায় আছড়ে পড়ে বহুদূর পর্যন্ত প্রচণ্ড জলের তোড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়—প্লাবনের সৃষ্টি করে আর এর ফলে ক্ষেতখামার ঘরদুয়ার তো যায়-ই সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষ আর গৃহপালিত পশুর প্রাণ যায়।'

টুটু বলে, 'এই ঝড়কে থামান যায় না কাকু ?'

'বৈজ্ঞানিকেরা ভাবছেন, কি করে এই ঝড়কে থামাতে না পারলেও, অন্ততঃ বশে আনা যায়।' অনির্বাণ বলল।

ড্রইং খাতা হাতে নিয়ে মণিমালা ছবিটার দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলে, 'দ্যাখো, ঝড়ের চোখটা কি ভয়ংকর। বাবাঃ। আমরা কিন্তু রেডিওর কথা শুনে আগে থেকেই সাবধান হয়ে যাব।'

পোঃ-হাটতুবা, ২৪-পরগনা

পোকাখেকো গাছ

তৃপ্তি রায়

বিস্মিত হবার কিছুই নেই, এ রহস্যভরা প্রকৃতিতে মানুষখেকো বাঘের মতো পোকাখেকো গাছও আছে। অন্য প্রাণী ভক্ষণ করে প্রাণধারণ করা শুধু প্রাণিজগতের একচেটে নয়, উদ্ভিদ্ জগতেও এদের দেখা পাওয়া যায়। সাধুভাষায় এদের বলা যেতে পারে 'পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ'। পিঁপড়ে, মাছি, মৌমাছি ইত্যাদি নানা ধরনের পোকামাকড় হচ্ছে এদের খাদ্য। এবং পোকা ধরার জন্যে নানারকম ব্যবস্থাও আছে। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে প্রায় সাড়ে চারশো জাতির পোকাখেকো গাছ। যে মাটিতে নাইট্রেট এবং ফস্‌ফেটের অভাব সেই মাটিতে এদের জন্ম হয়। নাইট্রেটের অভাব এরা পূর্ণ করে বিচিত্র খাদ্য থেকে। আমাদের দেশে দার্জিলিং পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে 'পিচার প্ল্যানট' পাওয়া যায়। লম্বা লম্বা ঘাসের সঙ্গে মিশে থাকে সাপের মতো ফণা তোলা 'নেপেনথেস্'। শান্তিনিকেতনের রুক্ষ খোয়াইয়ে পাওয়া যায় 'সানডিউ'। লাল কাঁকরের সঙ্গে মিশে থাকে লালচে ফুলের মতো পাতাগুলি এবং তার ওপর জ্বলজ্বল করে শিশিরবিন্দুর মতো আঠালো রস।

গাছের পাতাগুলি পোকা ধরা আর হজম করার জন্যে রূপান্তরিত হয় বিচিত্র ফাঁদে। 'পিচার প্ল্যানট' বলা হয় যাদের তাদের পাতার ফলকটি একটি ঢাকনাওয়ালা কলসীর মতো। কলসীভর্তি থাকে কী, জানো!' হজমী রসে ভর্তি জল। কলসীর ঢাকা দেখতে খুবই আকর্ষণীয় এবং মোমের মতো মোলায়েম। রূপে এবং গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে যে রসিকের আগমন ঘটে তার আর নিস্তার নেই। পা পিছলে মৃত্যুকূপে পতন হয় এবং ধীরে ধীরে জারকরসে জারিত হয় ঐ কলসীর মধ্যে।

আরেক জাতের পোকাখেকো গাছ আছে যাদের বলা হয় 'স্টীল ট্র্যাপার।' এদের পাতার দুটি অর্ধাংশ বন্ধ হয়ে যায় যে মুহূর্তে একটি পোকা এসে বসে। পাতার ভিতরটা বেশ লালচে দেখতে আর মধ্যে থাকে ভালো ভালো খাবার বোকা পোকাদের জন্যে। এদিকে বাইরের দিকে থাকে হাঙরের দাঁতের মতো শক্ত শুঁয়ো আর কিছু 'ট্রিগার হেয়ার।' পোকারা যেই খাবার খেতে ভিতরে ঢোকে 'ট্রিগার হেয়ার' নড়ে যায় আর সেই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যায় ফাঁদ। কিছু কিছু চালাক মাছি অবশ্য 'ঘুঘু দেখছে ফাঁদ দেখনি'র মতো ঠিক বেরিয়ে আসে। তাদের সংখ্যা অবশ্য খুবই কম।

এই পোকাখেকো গাছগুলোর কাছে ভিড় করে অন্য অনেক প্রাণী। কেন, বলো তো। খাবারের আশায়। নানারকম ব্যাঙ, গিরগিটি ইত্যাদি—যাদের খাদ্যও হলো নানারকম পোকা—তারা সব বেশ আরাম করে বিনা

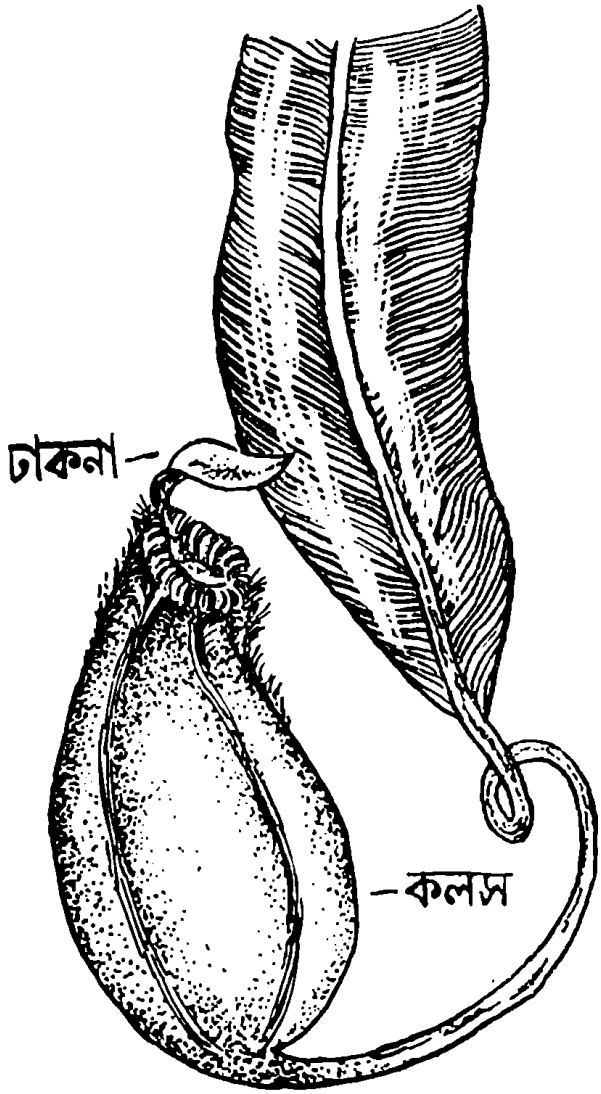

কষ্টে খাদ্য পেয়ে যায়। কিছু মাকড়সা আছে যারা 'পিচার প্ল্যান্টের ঢাকনার তলায় থাকে। পোকা এলেই খপ করে খেয়ে ফেলে। আবার বিপদ দেখলে কলসীর মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। একজাতের মশা আছে তাদের ডিম পাড়ার জন্যে কলসী গাছের বিশেষ জলটি চাইই। শান্তিনিকেতন বা দার্জিলিং বেড়াতে গেলে এবার সবাই লক্ষ্য রেখো দেখতে পাও কি না এদের।

২এ আলডোরাডা, ৩১৭ রক রোড, বান্দ্রা, বোম্বে-৫০

টিভি-তে যা দেখা যায় না!

অনীশ দেব

টিভি-তে নানান ছবি তোমরা দেখো। কিন্তু খুব কাছ থেকে দেখলে দেখতে পাবে, ছবিটা তোমার কাছে কেমন অস্পষ্ট লাগছে। কারণ, কতকগুলো—অগুনতি বলেও মনে হতে পারে—সরু সরু সমান্তরাল রেখা অনুভূমিক-ভাবে টিভির ছবিগুলোকে চিরে দিয়েছে। কিন্তু একটু দূর থেকে দেখলেই সব ঠিক হয়ে যায়। কখনও কি ভেবে দেখেছো, এরকমটা কেন হয়?

টিভি-তে ছবি ফুটে ওঠার আসল কারণ, ইলেকট্রন কণা এসে আঘাত করে টিভির পর্দায়, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আলো জ্বলে ওঠে। এই রকম সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আলোর বিন্দু দিয়ে ছবিটা তৈরি হয়ে যায়: ছবির যেখানে অন্ধকার সেখানে ইলেকট্রন কম আঘাত করে; আবার যেখানে বেশি উজ্জ্বল, সেখানে ইলেকট্রনের সংখ্যাও বেশি। এবারে দেখো, ছবিটা কিভাবে তৈরি হয়।

যে সরু সরু লাইনগুলোর কথা একটু আগে বলেছি, সেই লাইনগুলো হচ্ছে ইলেকট্রন কণার তৈরি রেখা। টিভির পর্দার একেবারে মাথার বাঁ দিকের কোণ থেকে ইলেকট্রন কণার স্রোত চলতে শুরু করে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে পথ চলে পর্দার ডান প্রান্তে এসে পৌঁছতেই তৈরি হয়ে যায় একটা অনুভূমিক রেখা। তারপর, সেই কণার স্রোত চোখের পলকে আবার চলে যায় বাঁ প্রান্তে—তবে প্রথমবারের চেয়ে একটু নীচে। শুরু হয় তার দ্বিতীয় দফার পথ চলা: বাঁ দিক থেকে ডান দিকে। এইভাবে বার বার সে একই দিকে লক্ষ্য রেখে পথ চলতে থাকে।

কণার স্রোতের যাতায়াতে এক সময় ভর্তি হয়ে যায় টিভির গোটা পর্দা। সৃষ্টি হয় অতি সূক্ষ্ম সরু অনুভূমিক কতকগুলো রেখার। যদি ঠিকমতো তুমি গুণে ফেলতে পারো, তাহলে, ওপর থেকে-নিচে, এই রেখার মোট সংখ্যা হল, 625। অর্থাৎ, এই 625টা লাইন সর্বসময় টিভির ছবি তৈরি করে।

বই পড়ার সময় তোমার চোখ যেভাবে এক লাইন থেকে আর এক লাইনে সরে যায়, টিভির এই ইলেকট্রন-রেখার চলাফেরাও ঠিক অনেকটা সেই রকম। তবে এই রেখার গতি তোমার চোখের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। 625টা লাইন টানতে ইলেকট্রন স্রোতের সময় লাগে মাত্র $\frac{1}{25}$ সেকেণ্ড: অর্থাৎ, এক সেকেণ্ডের পঁচিশ ভাগের একভাগ।

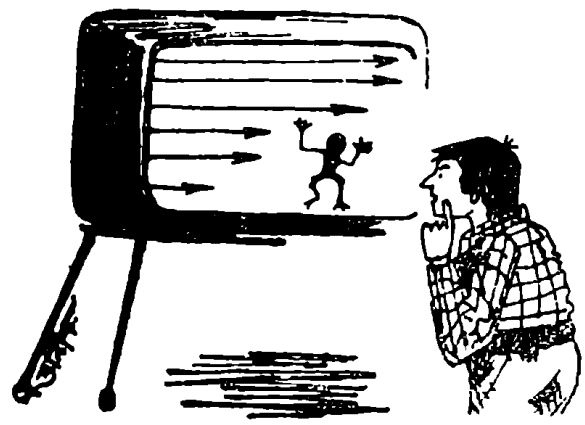

সুতরাং টিভির পর্দায় এক একটা ছবি তৈরি হয়ে যায় এই অল্প সময়ে, আর এক সেকেণ্ডে তৈরি হয়ে যায় পঁচিশটা ছবি!

এবারে তোমাদের জানিয়ে দিই, এই যে 625টা লাইনের কথা বললাম, বা সেকেণ্ডে পঁচিশটা ছবি তৈরি হওয়ার কথা তোমরা শুনলে, এই সংখ্যা দুটোর কোনোটাই কিন্তু আন্দাজে ঠিক করা হয়নি। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে বিজ্ঞানীরা এই সংখ্যা দুটো বের করেছেন। এই সংখ্যা দুটোর সঙ্গে যতো সম্পর্ক সব কিন্তু আমাদের চোখের।

যে কোন জিনিস যখন আমরা দেখি, তার ছায়া পড়ে আমাদের চোখের ভেতরে একটা পর্দায়। সেই পর্দার নাম রেটিনা। রেটিনায় কোন জিনিসের ছায়া পড়লে রেটিনা সেই ছায়াকে $\frac{1}{16}$ সেকেণ্ড ধরে রাখে। অর্থাৎ, ধরো, তোমাকে একটা লাল রঙের বল দেখানো হলো। বলের ছায়া রেটিনায় পড়লো, তুমি বলটা দেখতে পেলে। এবার যেই বলটা তোমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো, রেটিনার ছায়া কিন্তু তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হলো না। সে ছায়াটাকে আরও $\frac{1}{16}$ সেকেণ্ড ধরে রাখলো। ফলে বলটা সরিয়ে নেওয়া সত্ত্বেও সেটাকে তুমি $\frac{1}{16}$ সেকেণ্ড বেশি দেখতে পেলে। এই ঘটনাকে বলা হয় দৃষ্টির স্থায়িত্ব (Persistence of Vision)।

টিভি-তে যদি সেকেণ্ডে পঁচিশটা ছবির বদলে দশটা ছবি দেখানো হতো, তাহলে এক-একটা ছবির ছায়া

তোমার চোখের ভেতরে রেটিনায় পড়ে মিলিয়ে যাবার পর পরবর্তী ছবিটা টিভির পর্দায় হাজির হতো। ফলে ছবিগুলোর পরিবর্তন তোমার চোখে ধরা পড়ে যেতো। প্রত্যেকটা ছবিকে তুমি আলাদা করে দেখতে পেতে। এর ফলে টিভি-তে ছবি দেখতে কি অসুবিধে হতো সেটাই এবার শুনে নাও।

টিভি-তে সাধারণত আমরা এমন ছবি দেখি যে ছবি নড়েচড়ে বেড়ায়—অর্থাৎ, চলচ্চিত্র। অসংখ্য ছবির সমষ্টিকে খুব তাড়াতাড়ি পর পর দেখাতে পারলেই চলমান ছবি তৈরি হয়। এখন সেকেণ্ডে যদি মাত্র দশটা ছবি তোমার চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তুমি দেখবে, ছবির লোকটা কেমন যেন ঝাঁকুনি দিয়ে চলাফেরা করছে—অনেকটা তোমাদের দেখা মিকি হাউস বা ঐরকম কার্টুন ছবির মতো। সুতরাং এই অসুবিধেটা এড়াতে হলে এক সেকেণ্ডে দেখানো ছবির সংখ্যা হতে হবে কম পক্ষে পনেরোর বেশি।

এইসব কারণেই টিভি-তে সেকেণ্ডে পঁচিশটা ছবি দেখানো হয়—যা কিনা পনেরোর অনেক বেশি।

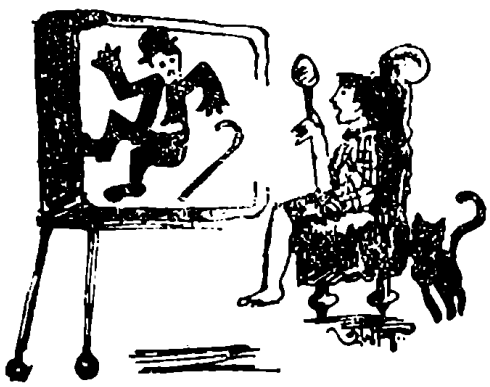

এইবারে আসা যাক লাইনের সংখ্যার প্রসঙ্গে। এক ডিগ্রি কোণকে সমান ষাট ভাগে ভাগ করলে সেই একটা ভাগকে বলা হয় এক মিনিট কোণ, বা সংকেতের সাহায্য নিলে, 1′।

মনে করো তোমার চোখ থেকে কিছুটা দূরত্বে দুটো সরলরেখা আঁকা রয়েছে। দুটো সরলরেখাকে যদি কাল্পনিক কোন রেখা দিয়ে তোমার চোখের মণির সঙ্গে যোগ করা হয়, তাহলে সেই কাল্পনিক রেখা দুটোর মধ্যে একটা ছোট কোণ তৈরি হবে।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, এই কোণ যদি এক মিনিটের বেশি হয়, শুধুমাত্র তখনই সরলরেখা দুটোকে তোমার চোখ আলাদা করে দেখতে পাবে। এক মিনিট বা তার কম হলে দুটো লাইনকে তোমার একটা লাইন বলে মনে হবে। এই রকম দুটো লাইন বা দুটো বিন্দুকে স্পষ্টভাবে আলাদা করে দেখতে পাওয়ার যে ক্ষমতা তাকে

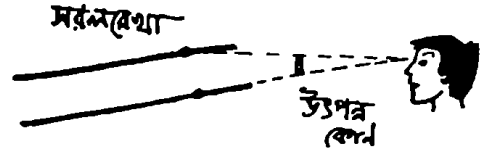

বলা হয় চোখের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Resolution)। সব স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন মানুষেরই এই ক্ষমতা মোটা-মুটিভাবে এক।

সুতরাং টিভির ছবির ঐ 625টা লাইনের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব এমনভাবে বাছা হয়েছে যাতে টিভি থেকে এক মিটার দূরে বসলে গোটা ছবিটা আমাদের চোখে মাত্র দশ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে। অর্থাৎ, মোট 600 মিনিট কোণ (কারণ, এক ডিগ্রি = 60 মিনিট। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, মোটামুটি একমিটার বা তার চেয়ে বেশি দূরে বসে টিভি দেখলে, ইলেকট্রনের তৈরি ঐ সরু সরু লাইনগুলো যেন আলাদা আলাদা ভাবে আমাদের চোখে ধরা না পড়ে। অথচ ছবি তৈরি করতে লাইনগুলো অপরিহার্য!

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যদি মোট ছ'শো লাইন টিভির পর্দায় থাকে, তাহলে যে কোন দুটো লাইন এক মিটার দূরে এক মিনিট কোণ উৎপন্ন করবে, যেহেতু গোটা ছবিটা উৎপন্ন করে 600 মিনিট কোণ।

একটু আগেই তোমাদের বলেছি; দুটো লাইনের উৎপন্ন কোণ এক মিনিট হলে লাইন দুটো আলাদা করে আর চেনা যাবে না—একই লাইন বলে মনে হবে। সুতরাং 600 লাইন টিভির পর্দায় থাকলেই আমাদের উদ্দেশ্য সফল হতো। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আরো বেশি সাবধানী। তাই তাঁরা আরো পঁচিশটা বেশি লাইন, অর্থাৎ, 625টা লাইনের ব্যবস্থা করেছেন।

এবারে জেনে নাও, এই ইলেকট্রনের স্রোত কতো গতিবেগে এই লাইনগুলো এঁকে চলে। ঘণ্টায় তিরিশ হাজার কি. মি.! অর্থাৎ, এই গতিবেগে দূরত্ব অতিক্রম করলে তুমি মাত্র এক ঘণ্টা কুড়ি মিনিটেই আমাদের পৃথিবীটাকে একটা পাক মেরে আসতে পারবে!

সুতরাং টিভির দাগের সব রহস্যই তোমাদের কাছে ফাঁস হয়ে গেল!

কল্পবিজ্ঞানের প্রবাদপুরুষ

জুলে ভার্নে • সুনীত রায়

ফ্রান্সের নান্তেস্ শহরে ১৮২৮ সালে জুলে ভার্ন এর জন্ম হয়। তাঁর বাবা চেয়েছিলেন, তিনি একজন মস্ত বড় উকিল হবেন। কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন খোলামেলা জীবন। বিপদ যেখানে সঙ্গী আর সেই বিপদকে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাওয়ার যে আনন্দ তাই তো সত্যিকারের জীবনের আনন্দ। সমুদ্রের ঢেউ-এর তাণ্ডব, দুর্গম মরুপ্রান্তর, ঘন গহন বনের দুর্বার আকর্ষণ তিনি প্রতিনিয়তই অনুভব করতেন, কিন্তু বাবা-মায়ের কঠোর শৃঙ্খল থেকে সেই দুর্বার ডাকে সাড়া কোনো দিনই দিতে পারেন নি। যখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর, তখন তিনি ওকালতি করতে প্যারিসে গেলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ঐসব কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে গল্প লেখা শুরু করলেন। তিনি যেহেতু জীবনে বেশী জায়গা বেড়ানোর সুযোগ পাননি সেজন্যে গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রকে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত জায়গাগুলো ঘুরিয়েছিলেন।

কয়েকটা ছোট গল্প লেখার পর, যে বই-এর অসামান্য ব্যবসায়িক সাফল্য, তাঁকে কল্পবিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ লেখকের স্বীকৃতি দিয়েছিল সেটা হল 'বেলুনে পাঁচ সপ্তাহ'। এতে তিনি দেখিয়েছিলেন কিভাবে চারটে লোক বেলুনে চড়ে এক অজানা মহাদেশ আফ্রিকা ভ্রমণ করে এলো। তিনি কল্পনা করেছিলেন, বেলুনে চড়ে আকাশে ঘুরলে কি কি জিনিস দেখতে পাওয়া সম্ভব। আর তাই পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, মরুভূমি, এমন কি বন্য প্রাণীদের এক আশ্চর্য সমাবেশ তাঁর লেখার মধ্যে দেখতে পাই।

জুলে ভার্নের সময়, বেলুনে চড়ে আফ্রিকা ভ্রমণ আশ্চর্য মনে হলেও বর্তমানে এরোপ্লেনের দৌলতে তা সম্ভব। সবচেয়ে মজার আর আশ্চর্যের ব্যাপার হল তিনি সে সময়ে আফ্রিকা সম্বন্ধে যা যা বলে গিয়েছিলেন পরবর্তীকালে মিলিয়ে দেখা হল, সবই সত্যি। পৃথিবীর গভীরে গেলে যে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, আর সেখানে যে লোহার মতো শক্ত ধাতুও তরল অবস্থায় থাকে, সে ধারণা তিনি যে কি করে করেছিলেন তাও আজ আমাদের কাছে একটা রহস্য। তাঁর আর একটি অসামান্য বই হল, "পৃথিবী থেকে চাঁদে।" এই গল্পে একটা কামান যানে তিনজন অভিযাত্রী আর একটা কুকুরকে সঙ্গে নিয়ে চাঁদে পাঠিয়েছিলেন আর চাঁদ ভ্রমণ করে যখন তারা ফিরে এল—তারা কিন্তু পৃথিবীর সমুদ্র পৃষ্ঠে অবতরণ করেছিল। ঠিক একই ধরনের অবতরণ আমরা দেখেছিলাম যখন জুলাই মাসের ১৯৬৯ সালে রকেট চাঁদ জয় করে পৃথিবীতে ফিরে এসেছিল। "টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস্ আণ্ডার দি সী" গল্পে ক্যাপ্টেন নীমো কি ভয়ঙ্কর অভিযানের মাধ্যমে তাঁর সহযোগীদের নিয়ে সমুদ্রের তলায় ভ্রমণ করেছিলেন, তা ভাবতেও অবাক লাগে। সেই সমুদ্রের তলায় চলমান নৌকা "নাটিলাস" থেকেই সাবমেরিনের জন্ম? জুলে ভার্ন সমুদ্রের তলার প্রাণীদের সম্বন্ধে এত সুন্দর বর্ণনা করেছেন, যা পড়লে বিশ্বাসই হতে চায় না, তিনি সমুদ্রে যানই নি। যে কোনো জিনিস তিনি এত সুন্দরভাবেবলতে পারতেন, যা শুনে মনে হোতো সবই বুঝি সত্যি? "এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডে'জ" প্রবন্ধে নায়ক মিঃ ফগ্ প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি আশি দিনের মধ্যে বিশ্বভ্রমণ করবেন। সে সময়ে এরোপ্লেনও ছিল না আর না ছিল মোটরগাড়ী বা ট্রেন। তা সত্ত্বেও কিভাবে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন, সেই নিয়েই লেখা হয় বইটা।

সাতাত্তর বছর বয়সে ১৯০৫ সালের ২৪শে মার্চ, কল্পবিজ্ঞানের প্রবাদ পুরুষ জুলে ভার্নের মৃত্যু হয়।

৭০১, ডায়মণ্ডহারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা-৭০০০৩৪

সংবাদ

ভারতীয় জাতীয় অ্যাকাডেমী বিজ্ঞান পুরস্কার

১৯৮১ সালের ভারতীয় জাতীয় অ্যাকাডেমী বিজ্ঞান পুরস্কার পাচ্ছেন, কলকাতার ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ফর্ দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্সের ম্যাগনেটিসম্ বিভাগীয় ডঃ বি. কে. চৌধুরী, কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাণীবিভাগীয় ডঃ আর. এন. চ্যাটার্জী, হায়দ্রাবাদের ন্যাশানাল জিও-ফিজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডঃ ইউ. সি. দাস, বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কেমিক্যাল টেকনোলজির ডঃ জে. বি. যোশী, নতুন দিল্লীর ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ টেকনোলজির গণিতবিভাগীয় ডঃ চিত্তরঞ্জন. পি. কাউি, পুনের ন্যাশানাল কেমিক্যাল ল্যাবরেটরীর কেমিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগীয় ডঃ বি. ডি. কুলকার্নি, আহমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরে-টরীর ডঃ ভি. কে. বি. কোটা, বাঙ্গালোরে রমন রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর লিকুইড ক্রিস্টাল ল্যাবরে-টরীর ডঃ এ. সি. কানোয়ার, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ হর্টিকালচারাল রিসার্চের ডঃ (শ্রীমতী) সুখদাম মোহনদাস, হায়দ্রাবাদ ওস্মানিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের জিওফিজিক্স বিভাগীয় ডঃ আর. নগেন্দ্র, গোয়ালিয়র ডিফেন্স রিসার্চ এণ্ড্ ডেভেলপ্‌মেণ্ট অ্যাসট্যাবলিস্‌মেণ্ট এর মাইক্রোবায়োলজী বিভাগীয় ডঃ প্রকাশ. এস. নাগারকাট্টি, হায়দ্রাবাদ সেণ্টার ফর সেলুলার এণ্ড্ মলিকিউলার বায়োলজীর ডঃ আর. নাগারাজ, কলকাতা ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ কেমিক্যাল বায়োলজীর এনজাইম্ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগীয় শ্রী ডি. পেইন, ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল ইনস্টিটিউটের স্ট্যাটিসটিক্যাল ম্যাথামেটিক্স বিভাগীয় ডঃ এস. এম. শ্রীবাস্তব, বোম্বাই ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেণ্টারের চিকিৎসাবিভাগীয় ডঃ কে. বি. সৈনিস্, লুধিয়ানা পাঞ্জাব অ্যাগ্রিকালচারাল ইউনিভার্সিটির প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগীয় ডঃ কুলদীপ এস. সিধ্যু, গোরক্ষপুর ন্যাশানাল পেষ্টিসাইড ল্যাবরেটরীর ডঃ আর. ডি. ত্রিপাঠী, হায়দ্রাবাদ অল্ ইণ্ডিয়া কো-অর্ডিনেটেড রিসার্চ প্রজেক্ট ফর ড্রাইল্যাণ্ড অ্যাগ্রিকাল-চারের ডঃ কে. পি. আর ভিট্টল, লক্ষ্ণৌ সেণ্টার ইনস্টিটিউট্ অব্ মেডিক্যাল এণ্ড্ অ্যারোমেটিক প্লাণ্টসের এগ্রোনমী এণ্ড সয়েলস্ বিভাগীয় ডঃ আর. এল যাদব।

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন মেডেল

ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমী বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয়ে অসাধারণ কাজের ওপর ভিত্তি করে তিন বছর অন্তর তিনটি বিশেষ মেডেল দেন। এরই একটি চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন মেডেল। ১৯৮২তে-মলিকিউলার বায়োফিজিক্স এণ্ড্ ক্রিস্ট্যালো-গ্র্যাফীর ওপর বিশেষ গবেষণা নৈপুণ্যের জন্যে অধ্যাপক জে. এন. রামচন্দ্রনকে এই সি. ভি. রামন দেওয়া হয়েছে।

জগদীশচন্দ্র বসু মেধা-অনুসন্ধান বৃত্তি

১৬ই এপ্রিল, ১৯৮২ যাদবপুরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টি-টিউট অফ্ কেমিক্যাল বায়োলজীর হলে একুশতম জগদীশচন্দ্র বসু জাতীয় বিজ্ঞান মেধা অনুসন্ধান পুরস্কার দেওয়া হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীভৈরবদত্ত পাণ্ডে বলেন এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যারা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের খুঁজে বের করছেন এবং দেশের রত্ন হিসেবে বৃত্তি দিয়ে তৈরী করছেন তাদেরকে সরকারের উচিত আর্থিক সাহায্য করা। শোনা যায় কেন্দ্রীয় সরকারের এই ধরনের মেধা অনুসন্ধান কমিটির প্রচুর টাকা আছে। তিনি বলেন যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে দুটি স্কলারশীপ অনুদান এই সংস্থাকে দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রফেসর নুরুল হাসান এই সংস্থাকে কাউনসিল অফ্ সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইনডাসট্রিয়াল রিসার্চ-এর পক্ষ থেকে অধিক মাত্রায় অর্থ সাহায্য দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

এ বছর একটি মাত্র পুরস্কার মেধা প্রজেক্ট প্রদর্শনী উপলক্ষে দেওয়া হয়, এটি লাভ করেন অরুন চিনড্রিপু। জগদীশচন্দ্র বসু ট্রফি লাভ করেন সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

গোলীয় তলে প্রতিফলন

ডঃ অলক চক্রবর্তী

মেলায় বা প্রদর্শনীতে তোমরা নিশ্চয়ই "লাফিং মিরর" দেখেছ। নীচের ছবি দুটোতে দেখ [চিত্র (1) এবং (2)]। সুন্দর ভদ্রলোকের বিভিন্ন গোলাকৃতি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কিরকম অবস্থা হয়েছে। আসলে

চিত্র-1

চিত্র-2

এখানে আয়নাগুলি সমতল নয়, গোলাকৃতি। এদের বলে গোলকীয় আয়না। গোলকীয় আয়না একটা ফাঁপা গোলকের কিছুটা অংশ বিশেষ। একটা ফাঁপা গোলকের কিছুটা অংশ মাপ করে কেটে ফেলে, তাকে পালিশ করে বা রূপোর প্রলেপ লাগিয়ে গোলকীয় আয়না তৈরী করা হয়। এই ধরনের আয়না দু'রকমের, অবতল এবং উত্তল।

অবতল আয়নায় মধ্যের অংশটি পেছিয়ে থাকে। কিন্তু উত্তল আয়নায় মধ্যের অংশটি এগিয়ে থাকে [চিত্র (3) এবং (4)]। অর্থাৎ যখন কোন আয়নার অবতল

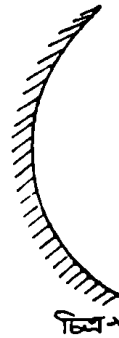

চিত্র-3

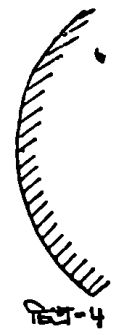

চিত্র-4

পৃষ্ঠটি প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহার করা হয় তখন সেটি অবতল আয়না। বিপরীতক্রমে উত্তল পৃষ্ঠ প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহৃত হলে সেটি হবে উত্তল আয়না।

উত্তল বা অবতল আয়নায় প্রতিফলনের পর কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব কি রকম হবে, আমরা এবারে সে সম্বন্ধে আলোচনা করব। কিন্তু তার আগে আমাদের কয়েকটি সংজ্ঞা শিখে নিতে হবে। এসো সেগুলো শেখা যাক।

প্রতিফলক পৃষ্ঠের মধ্যবিন্দুকে আয়নার মেরু বলে [চিত্র নং (5) c বিন্দু]।

গোলীয় আয়না যে গোলকের অংশবিশেষ, সেই গোলকের কেন্দ্রকে আয়নার বক্রতা কেন্দ্র বলে [চিত্র নং (5) o বিন্দু]।

আর এই গোলকের ব্যাসার্ধকে বক্রতা ব্যাসার্ধ বলে [চিত্র নং (5) OM, OC, ON]।

বক্রতা কেন্দ্র এবং মেরু সংযোগকারী সরলরেখাকে প্রধান অক্ষ বলে [চিত্র (5) OC রেখা]।

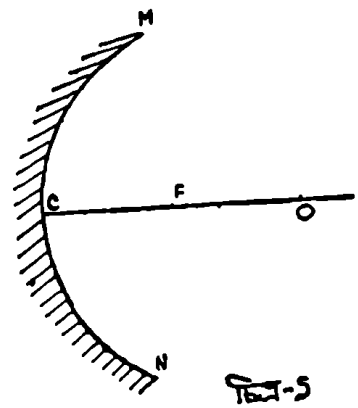

চিত্র-5

M এবং N [চিত্র নং 5] হচ্ছে আয়নার দুই অন্তিম প্রান্ত। MN দূরত্বকে আয়নার উন্মেষ বলে। আমরা

আয়নার উন্মেষ খুব ছোট বলে ধরব। আয়নার উন্মেষ বড় হলে কি কাণ্ড হয় সেটা 1 এবং 2 নং চিত্র থেকে দেখতে পাব। প্রধান অক্ষের উপর একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আছে যাকে ফোকাস বলে। যখন কোন অবতল আয়নার উপর একগুচ্ছ রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে আপতিত হয় তখন আয়নার মধ্য দিয়ে প্রতিফলনের পর এই রশ্মিগুলি প্রধান অক্ষের উপর একটি বিন্দুতে ছেদ

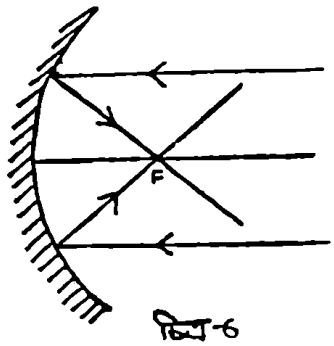

চিত্র-6

করে। এটাই হল প্রধান ফোকাস [চিত্র নং (6) F বিন্দু]। উত্তল আয়নার ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি-গুলোকে প্রতিফলনের পর মনে হয় যেন তারা প্রধান

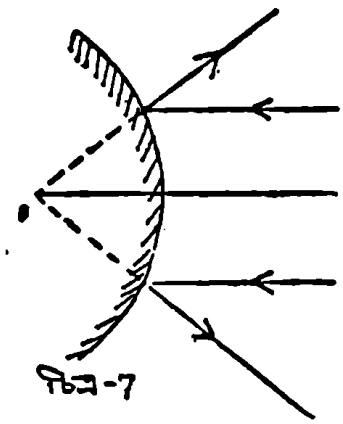
চিত্র-7

অক্ষের উপর একটি বিন্দু থেকে ছড়িয়ে পড়ছে বা অপসৃত হচ্ছে। এটাই প্রধান ফোকাস [চিত্র নং 7 F বিন্দু]।

প্রধান ফোকাস থেকে মেরু দূরত্বকে ফোকাস দূরত্ব বলে। একটি আয়না সমতল, অবতল বা উত্তল কি-না তা আয়নার খুব কাছে হাতের একটি আঙুল ধরলেই সহজে নির্ধারণ করা যায়। আমরা জানি যে, সমতল আয়নার সামনে কোন লক্ষ্য বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব সমশীর্ষ, অসদ্, এবং আকারে লক্ষ্য বস্তুর সমান হয়। অবতল আয়নার ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সমশীর্ষ অসদ্ ও আকারে লক্ষ্য বস্তুর থেকে বড় হয় এবং উত্তল আয়নার ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সমশীর্ষ, অসদ্, কিন্তু আকারে ছোট হয়। সুতরাং কোন আয়নার সামনে আঙুল রাখলে যদি আঙুলের আকারের সমান প্রতিবিম্ব দেখা যায় তবে আয়নাটি সমতল, যদি প্রতিবিম্ব আঙুলের চেয়ে বড় হয় তাহলে আয়নাটি অবতল এবং আয়নাটি উত্তল হবে যদি প্রতিবিম্ব আঙুলের আকারের থেকে ছোট হয়।

গোলকীয় আয়নার সামনে কোন বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় এবং কিরকম হবে জানতে গেলে আমাদের কয়েকটি নিয়ম জানতে হবে। নিয়মগুলি হচ্ছে :—

1. অবতল আয়নার ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মি প্রতিফলনের পর ফোকাস দিয়ে যাবে।

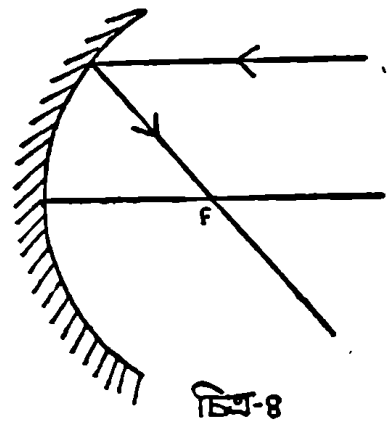

চিত্র-8

বিপরীত ক্রমে ফোকাস দিয়ে কোন আলোক রশ্মি গেলে প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্ত-রাল হয়ে যাবে [চিত্র (8.) এবং (9.)] দেখো তবে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।

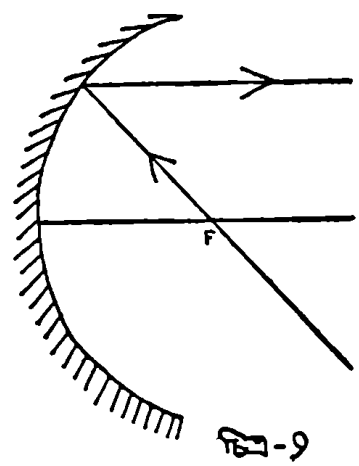

চিত্র-9

2. উত্তল আয়নার ক্ষেত্রে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশ্মি প্রতিফলনের পর এমন ভাবে যাবে যাতে

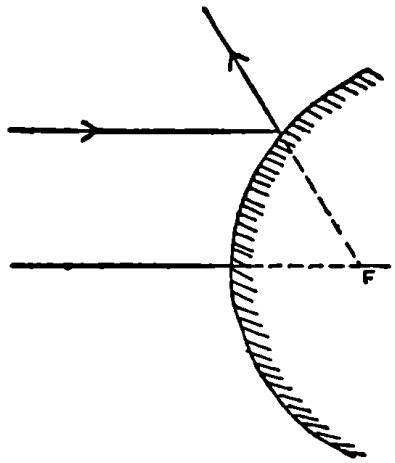

চিত্র-10

মনে হয় প্রতিফলিত রশ্মি ফোকাস থেকেই আসছে। বিপরীতক্রমে ফোকাস অভিমুখে আগত কোন রশ্মি প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরাল হয়ে যাবে। [চিত্র (10) এবং (11)]।

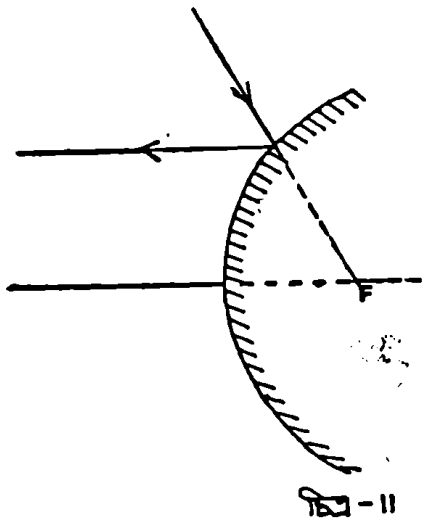

চিত্র-11

3. বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে কোন আলোক রশ্মি গেলে, প্রতিফলিত রশ্মি ঐ রেখা বরাবরই প্রতিফলিত হবে বা ফিরে আসবে। 12 নং এবং 13 নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে PQ হচ্ছে আপতিত রশ্মি এবং QP হচ্ছে প্রতিফলিত রশ্মি।

অবতল এবং উত্তল আয়নার সামনে বিভিন্ন দূরত্বে কোন বস্তু রাখলে তার প্রতিবিম্ব কোথায় এবং কি রকম মাপের হবে সেটা জানতে গেলে উপরের তিনটি নিয়ম প্রয়োগ করতে হবে। আমরা একটি করে ক্ষেত্র আলোচনা করছি। মনে হয় আঁকার পদ্ধতিটা সহজেই বুঝতে পারবে। তখন যদি তোমরা আলাদা আলাদা অবস্থানে

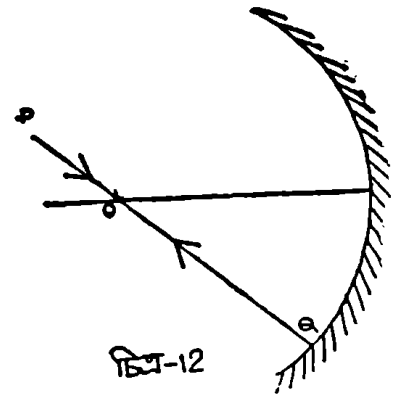

চিত্র-12

বস্তু রেখে প্রতিবিম্বের এবং অবস্থান এঁকে ফেল তাহলে আর তোমাদের পায় কে? 14 নং চিত্রে দেখ NM

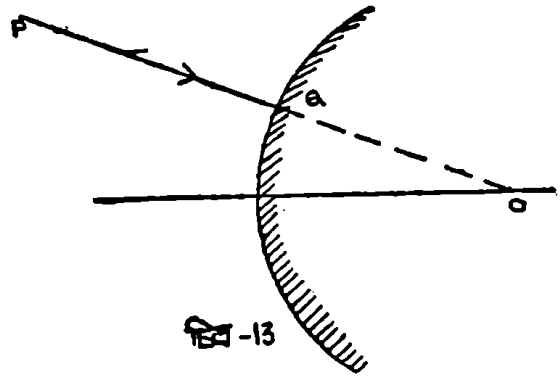

চিত্র-13

হচ্ছে একটি অবতল আয়না এবং PQ হচ্ছে প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে রাখা কোন বস্তু। প্রথমে Q বিন্দুটির প্রতিবিম্ব পাওয়ার চেষ্টা করা যাক। Q বিন্দু থেকে

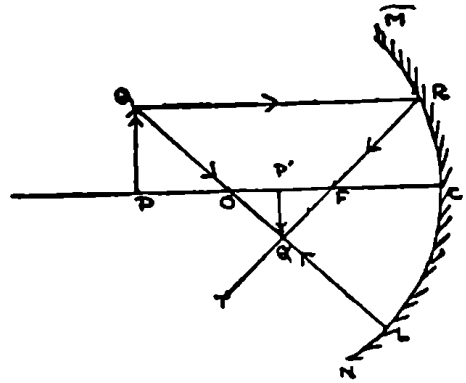

চিত্র-14

QR রেখা প্রধান অক্ষের সমান্তরাল করে আঁকা হল। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিফলনের পর প্রতিফলিত রশ্মি ফোকাস দিয়ে যাবে। তাহলে RFT হবে প্রতিফলিত রশ্মি। আবার Q বিন্দু থেকে বক্রতা কেন্দ্রে O দিয়ে QOL

আপতিত রেখা আঁকা হল। যেহেতু এটি বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রতিফলনের পর এটি LOQ পথে ফেরত আসবে। Q বিন্দু থেকে আঁকা দুটি আপতিত রশ্মি তাহলে প্রতিফলনের পর যথার্থ Q′ বিন্দুতে মিলিত হবে। অর্থাৎ Q′ হল Q-এর প্রতিবিম্ব। এবার Q-এর ঠিক নীচের বিন্দুটি যদি বস্তু হিসাবে কল্পনা করি তাহলে তার প্রতিবিম্ব Q′-এর ঠিক উপরেই থাকবে। এভাবে QP সরলরেখা প্রত্যেকটি বিন্দুর প্রতিবিম্ব Q′P′-এ থাকবে। অর্থাৎ Q′P′ হল QP-এর প্রতিবিম্ব।

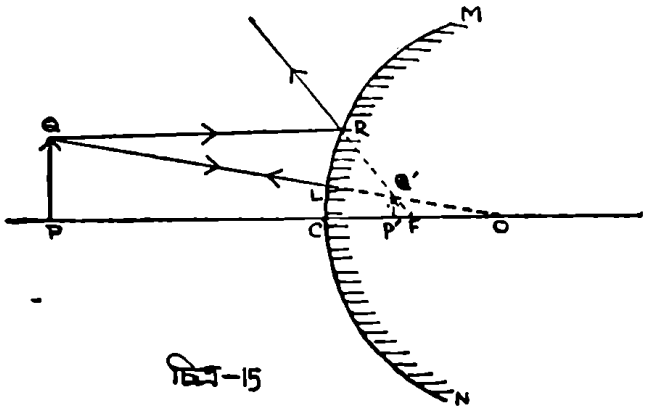

চিত্র–15

উত্তল আয়নার ক্ষেত্রে একই ভাবে আমরা অগ্রসর হতে পারি। 15 নং চিত্রটি ভাল করে দেখ। এখানেও QP হচ্ছে বস্তু। QR রেখা প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল। প্রতিফলনের পর রশ্মিটি FRT বরাবর বেরিয়ে আসবে [2 নং নিয়মটি দেখ]। আবার QL রেখাটি যেহেতু বক্রতা কেন্দ্র দিয়ে যাচ্ছে সেহেতু LQ পথে প্রতিফলিত হয়ে ফেরত আসবে। যেহেতু এই দুই প্রতিফলিত রশ্মি Q′ বিন্দুতে ছেদ করেছে বলে মনে হচ্ছে তাই Q′ হবে Q-এর প্রতিবিম্ব।

একই ভাবে আমরা Q-এর ঠিক নীচের বিন্দুটির Q′-এর নীচের বিন্দুটিতে পাব। এইভাবে QP বস্তুটির পুরো প্রতিবিম্ব Q′P′ হবে।

ভাল করে দেখ অবতল আয়নায় প্রতিবিম্বটি সদ্, কিন্তু উত্তল আয়নায় প্রতিবিম্বটি অসদ্।

অবতল আয়নার নানা রকম ব্যবহার আছে। প্রতিফলিত দূরবীনে (Reflecting telescope), অবথ্যালমোস্কোপ, দাড়ি কাটার আয়নায় ; কোন কোন তড়িৎ প্রবাহ মাপার যন্ত্রে – অবতল আয়নার ব্যবহার আছে।

আবার উত্তল আয়নারও নানারকম ব্যবহার আছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল মোটর গাড়ীর চালকের সামনে একটু উপরের দিকে যে উত্তল আয়না রাখা থাকে। এর ফলে চালক পিছনের গাড়ীঘোড়ার অনেকাংশই দেখতে পান।

তোমার কাজ ঃ কয়েকটা ছবি আঁকবে ? অবতল এবং উত্তল আয়নার সামনে বস্তু থাকবে, তার প্রতিবিম্ব কোথায় হবে তোমাকে আঁকতে হবে। বস্তুটি কোথায় থাকবে সেটা অবশ্যই আমি বলে দিচ্ছি।

(1) বস্তুটি বক্রতা কেন্দ্রের উপরে থাকবে।

(2) বস্তুটি বক্রতা কেন্দ্র এবং ফোকাসের মধ্যে থাকবে।

(3) বস্তুটি ফোকাসে থাকবে।

(4) বস্তুটি ফোকাস এবং মেরুর মধ্যে থাকবে।

অবতল, উত্তল নিয়ে মোট আটটি ছবি। গরমের ছুটি এখনও বেশ কয়েকদিন আছে। না হয় রোদ্দুরে একটু কমই ঘুরলে, কেমন!

● মজার ছবি। — প্রণব ঘোষ

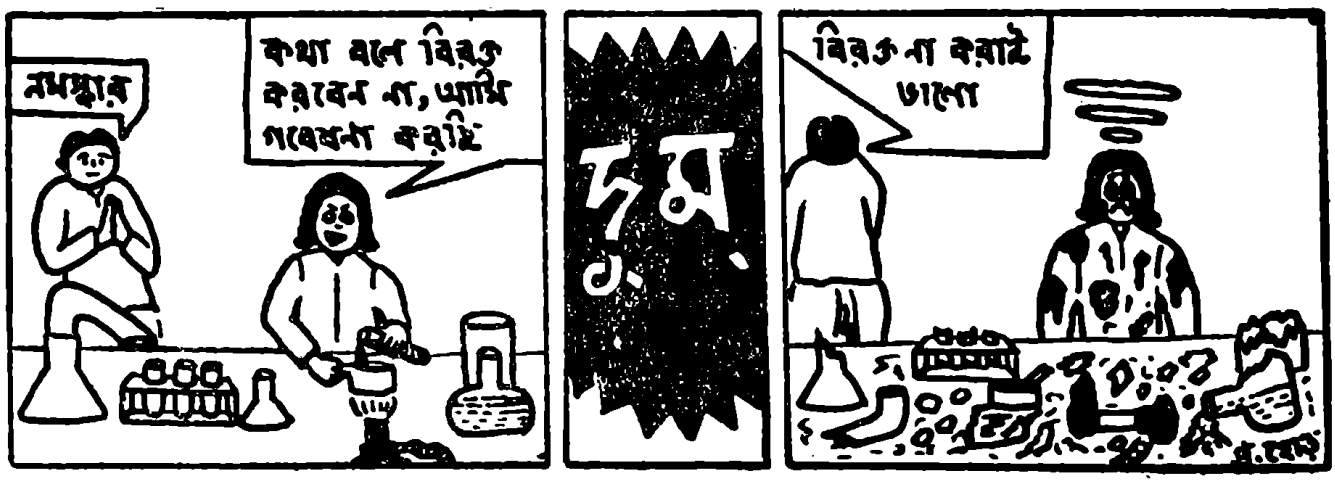

আগে যা ঘটেছে

মফঃস্বল শহরের একটি বড় ব্যাঙ্কে চাকরি নিয়ে এসেছে সুশান্ত। একেবারে ম্যানেজারের চাকরি। ব্যাঙ্কের নামটিও অদ্ভুত। অল ইণ্ডিয়া কমন পিপলস্ ব্যাঙ্ক লিমিটেড। সংক্ষেপে এ.আই.সি.পি. ব্যাঙ্ক লিঃ। সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত জায়গায় এলেও জায়গাটা সুশান্তর খুবই ভাল লেগেছে। ট্রেন থেকে নেমে রিক্সা করে যেতে যেতেই নজরে পড়েছে—একটি ছোট্ট নদী। চারপাশে বালি ও পাথরের টুকরোর মাঝখানে বয়ে চলেছে কুল কুল করে। শহরটা ছোট হলেও বেশ কয়েকটি বড় বড় কলকারখানা রয়েছে। বড় বড় পাইকারী কারবারও রয়েছে কয়েকটি। তাই ব্যাঙ্কটি ছোট হলেও লেন-দেন বেশ ভালই হয়। চাকরির কয়েক দিনের মধ্যেই সুশান্ত নাম-না-জানা নদীটির ধারে একা একা বসে এসবই ভাবছিল। ব্যাঙ্কের বেশীর ভাগ কর্মচারীই—তার চাইতে বয়সে বড়। একটা কমবয়েসী ম্যানেজারের হুকুম তামিল করতে অনেকেই একটু অখুশী। নদীর ধারে বসে সুশান্ত এ সব কথাই ভাবছিল। এখানে সে একেবারে একা। বন্ধু-বান্ধব কেউই নেই। তাই সুশান্ত প্রায়ই এই নদীর ধারে সন্ধ্যাবেলা এসে বসে। মাঝে মাঝে ভাবে কবিতা লিখবে। মিল না হয় নাই হল। এখানেই হঠাৎই তার আলাপ হয়ে গেল—সরযূপ্রসাদের সংগে। সরযূপ্রসাদ স্থানীয় লোক। অবাঙালী হলেও ভাল বাংলা বলে। কলকাতায় একটা বড় কলেজে পড়াশোনা করেছে। সেখানে তার বন্ধু-বান্ধবও সব ছিল বাঙালী। সেদিন অনেক কথাই হল দুজনের মধ্যে। কথায় কথায় সরযূপ্রসাদ জানাল সম্প্রতি একটি ফাংশন হচ্ছে শহরে। আয়োজন করেছে এখানকারই একটা ক্লাব। ক্লাবের ফাংশানে সুশান্তকে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়ে সেদিনকার মতো বিদায় নিল সরযূপ্রসাদ।

তিন

সরযূপ্রসাদের সাহায্যে ক্লাবে এসে সুশান্তর আরও অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'ল, এবং দেখতে দেখতে সে আলাপ বেশ জমে উঠল। ক্লাবে শুধু খেলাধূলারই ব্যবস্থা ছিল না—ছিল প্রচুর আড্ডার ব্যবস্থা, তা ছাড়া একটা ছোটখাটো লাইব্রেরীও ছিল। সুশান্ত সেখান থেকে ইংরাজী বাংলা এবং হিন্দি বইও নিয়ে পড়তে শুরু করল। হিন্দী সে সামান্য শিখেছিল, এখানে এসে বেশ রপ্ত হয়ে উঠল।

এমনি ভাবে দিন গড়িয়ে চলছিল। তবে মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর অবস্থাও যে আসত না তা নয়, সুশান্ত কর্তা হিসাবে ছিল বেশ কড়া, এবং কয়েকজন পুরোনো কর্মচারী সেটা তেমন ভালোর চোখে দেখত না। তার বিরুদ্ধে যে ভিতরে ভিতরে একটা জোট পাকানো হচ্ছে তা সে বেশ বুঝতে পারছিল। প্রথমটা সে ওটার ওপর তেমন গুরুত্ব দেয় নি, কিন্তু ইদানীং যেন মনে হচ্ছে ওটা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, উপেক্ষা করা ঠিক নয়। ব্যাঙ্কের প্রায় সমস্ত কর্মচারীই স্থানীয় অধিবাসী কিংবা আশপাশের অঞ্চল থেকে এসেছে, কাজেই কারো সঙ্গে যে মন খুলে একটু পরামর্শ করবে এমন সুযোগ ছিল না তার।

ইতিমধ্যে সরযূপ্রসাদের সঙ্গে তার আলাপ ক্রমশঃ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। সরযূপ্রসাদ শিক্ষিত, বড়লোকের ছেলে, তার ওপরে গত কয়েক বছর আমেরিকার শিকাগো শহরে কাটিয়ে এসেছে। চালচলনে সে ছাপ এখনও রয়ে গেছে। অবশ্য চাকরিবাকরি সে কিছু করে না, করবার দরকারও হয় না। তাদের পরিবারে আছে বিরাট এজমালী কারবার। তা থেকে যে লাভের অংশ ওদের ঘরে আসে তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট বেশি। আর ব্যবসা চালাবার ঝুক্কিও ওকে পোহাতে হয় না, তার জন্য আছে জ্ঞাতি ভাইরা—ওর জ্যাঠতুতো দাদারা। তাঁরা এ ব্যাপারে একেবারে ঝানু। কাজেই সরযূপ্রসাদ বেশ নির্ঝঞ্ঝাটেই আছে। মাঝে মাঝে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিতে বা টাকা তুলতে আসে এবং তখন ম্যানেজার সাহেব অর্থাৎ সুশান্তর ঘরে বসেও খানিকটা সময় কাটিয়ে যায়। ওরা এখন পরস্পরকে নাম ধরে ডাকে, তুমি বলেই সম্বোধন করে।

একদিন ক্লাব থেকে ফিরবার পথে সরযূপ্রসাদই কথাটা তুলল। 'সুশান্ত ভাই, তোমাকে ক'দিন থেকে কেমন যেন আনমনা দেখছি, কি ব্যাপার বলো তো?"

সুশান্ত একটু ইতস্ততঃ করে শেষে কারণটা বলেই ফেলল। শুনে সরযূপ্রসাদ খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো,

তার পর বলল, "হুঁ, তুমি ঘাবড়িও না, ওর ওষুধ আমার জানা আছে। জান তো আমি কয়েক বছর আমেরিকায় ছিলাম, নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে আমার সে সময়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ওষুধের পথ আমি বাৎলে দেব।"

বাড়াবাড়ি বলতে কতটুকু বোঝায় ত সুশান্ত ঠিক ধরতে পারলো না। কয়েকদিন আগে একটা তুচ্ছ কারণে তাকে কয়েক ঘন্টা ঘেরাও হয়ে থাকতে হয়েছিল। অবশ্য স্লোগান দেওয়া ছাড়া কেউ অন্য কোন উপদ্রব করেনি। ছাড়া পেয়েছিল ঘটনা তিনেক বাদে। আর ছাড়া পাবার পর, সে তার যে কোটটা দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিল সেটা আর খুঁজে পায় নি, এটাকে কি বাড়াবাড়ি বলা চলে? খবরের কাগজে এরকম ঘটনা তো নিত্যই পড়ছে সে। যা সর্বত্র হচ্ছে তাকে কি বাড়াবাড়ি বলা চলে? বলি বলি করেও ও কথাটাও সরযূপ্রসাদকে বলতে পারলো না।

কিন্তু একদিন সত্যিই বাড়াবাড়ি হ'ল। ক্যাশে টাকা দিতে অস্বাভাবিক সময় লাগে বলে কিছুদিন থেকে তার কাছে অভিযোগ আসছিল। সেদিন পরীক্ষা করবার জন্য সে অলক্ষ্যে গিয়ে ক্যাশ কাউন্টারের কেরাণীটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনে বাইরের দিকে তখন প্রায় লাইন দিয়ে লোক জমে গেছে, কিন্তু কেরাণীবাবুর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, তিনি আপন মনে পাৎলা সিগারেটের কাগজে আলগা তামাকের মশলা মুড়তে মুড়তে পাশের সহকর্মীর সঙ্গে নিজেদের সুখ-দুঃখের গল্প করে চলেছেন। বাইরে থেকে একজন একটু তাগাদা দিতেই তিনি একেবারে খেঁকি কুকুরের মত খেঁকিয়ে উঠলেন। মুখে একটা কুৎসিৎ ভঙ্গী করে জানালেন, তাঁর যখন সময় হবে তখন টাকা দেওয়া শুরু করবেন। এ সব টাকা-পয়সার লেনদেনে সময় লাগবেই। কারো দাঁড়াবার সময় না থাকলে তিনি স্বচ্ছন্দে যে চুলোয় খুশি চলে যেতে পারেন, কেরাণী বাবু তাতে কোন বাদ সাধবেন না। বলেই আবার মুখ ঘুরিয়ে গিয়ে সহকর্মীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলেন।

সুশান্তর আর সহ্য হল না, সে ধমকের সুরে বলল, "এটা হচ্ছে কি? এটা অফিস না আড্ডাখানা? এতগুলো লোককে দাঁড় করিয়ে রেখে আপনি আজে বাজে গল্প করে সময় নষ্ট করছেন!"

ব্যস, বাবুদের স্তূপে আগুন পড়ল যেন! ব্যাঙ্কের যেখানে যত কর্মচারী ছিল ভোজবাজীর মত মুহূর্তে সবাই নিজের নিজের আসন ছেড়ে ছুটে এল। তাদের সকলেরই বক্তব্য এক ম্যানেজার সাহেব নিজেকে কি মনে করেছেন? তিনি বাদশাহ আর ওরা গোলাম? প্রবীণ ব্যক্তিকে অপমান! এখুনি সকলের সামনে ক্ষমা চাইতে হবে। নইলে,—নইলে আজ থেকেই স্ট্রাইক্।

সুশান্তও বেঁকে বসল। কক্ষনো না। অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবে না সে কিছুতেই।—না, মরে গেলেও না। কর্ স্ট্রাইক। বয়ে গেল তার।

সত্যি স্ট্রাইক শুরু হয়ে গেল তক্ষুনি। সবাই হাত গুটিয়ে নিজের নিজের চেয়ারে গিয়ে চুপচাপ বসে রইল খানিকক্ষণ। তার পর খতাপত্র বন্ধ করে, ইতস্ততঃ ছড়ানো কাগজপত্র কাগজ চাপা দিয়ে উঠে পড়ল একজোটে। বাইরে যে সব লোক দাঁড়িয়েছিল তারা তো ব্যাপার দেখে থ। আর তাদের চোখের সামনে দিয়ে এক এক করে সবাই বেরিয়ে গেল ব্যাঙ্ক থেকে।

সুশান্ত খানিকক্ষণ হতবুদ্ধির মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার পর দাঁতে ঠোঁট কামড়ে নিজের ঘরে ঢুকে পড়ল। বাইরের টিটকারি, শাসানি কিছুই যেন তার কানে ঢুকছিল না।

স্ট্রাইক চলল এক দিন—দু'দিন—তিন দিন। থামবার নাম নেই। সুশান্ত ভারী মুষড়ে পড়ল। এদিকে শহরেও নানা কানাঘুষা চলছে তার নামে। সত্যি, বড় ব্যাঙ্ক বলতে এখানে ঐ একটাই। সেখানকার সব কাজ বন্ধ হয়ে গেলে ব্যবসাদারদের চলবে কি করে? সাধারণ মানুষদেরও কম অসুবিধে হচ্ছে না। আর এর মূল কারণ হচ্ছে ঐ ছোকরা "বংগালী ম্যানেজার সাহিব।"

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। ক্লাবে যেতে আর ভাল লাগছে না। নদীর ধারে গিয়ে বসতেও ইচ্ছে করছে না। বরঞ্চ কারো সঙ্গে পরামর্শ করা যায় কিনা মনে মনে ভাবছে সুশান্ত, এমন সময় ঘরে ঢুকল সরযূপ্রসাদ। মুখে তার উদ্বিগ্ন ভাব যা সে গোপন করার চেষ্টা করে নি। ঢুকেই বলল, "তোমাকে নিয়ে তো বেশ হৈ-চৈ চলছে শহরে। এ সব ছোট খাট জায়গায় আর একটু ট্যাক্‌টফুলি চলতে হয়। দেখ তো কী কাণ্ড শুরু করেছে ওরা। যাই হোক, তোমাকে একটা গোপন খবর দিতে এসেছি। ওরা তোমাকে বিপদে ফেলবার জন্য আরও প্যাঁচ কষতে পারে। স্ট্রংরুমটা—যেখানে ব্যাঙ্কের টাকাপয়সা, নোটটোটগুলো থাকে, সেটার একটা চাবি নিশ্চয় তোমার কাছে থাকে?"

"হ্যাঁ। তবে একটা চাবি দিয়ে তো খোলা যায় না, ক্যাশিয়ারের কাছেও থাকে একটা। খুলবার দরকার হলে দু'জনে একত্র হয়ে দুজনের চাবি ঘুরিয়ে তার পর খোলা হয়।"

"ক্যাশিয়ার লোকটি কেমন?"

"কি জানি! এদের কাণ্ডকারখানা বোঝা ভার। এখন তো মনে হচ্ছে যাদের নির্বিকার,—সাতেও নেই পাঁচেও নেই

ভাবতাম,—তারাও ওদের দলে গিয়ে জুটেছে কিংবা হয়তো ভয় দেখিয়ে দলে টেনে নেওয়া হয়েছে ওদেরকে"

"হুঁ। তা যাক। তোমার চাবিটা খুব সাবধানে রেখেছ তো? স্ট্রংরুমে কোন গোলমাল বাঁধলে কিন্তু তোমায় বাঁচানো শিবেরও অসাধ্য।'

সুশান্ত ঘাড় নেড়ে বলল, 'তা জানি, তুমি আর কি বোঝাবে? কখনও কাছছাড়া করি না ওটা।"

"ও ঃ, তাই বুঝি? সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখ। বেশ, দেখি কেমন মজবুত চাবি? না, থাক, আমি, হাজারহোক, বাইরের লোক, ও চাবি টাবি আমার সামনে বার না করাই ভালো।"

সুশান্তের মুখে এবার একটু হাসি দেখা দিল। বলল "তাই নাকি? তুমিও ছিনতাই'এর দলে আছো বুঝি? কিন্তু কেমন করে করবে? চাবি যে আমার পৈতের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা; আর, জান তো, বামুনরা কখনও পৈতে ছাড়া থাকে না। অবশ্য নেহাৎ আধুনিক বামুনদের কথা বলছি না। কিন্তু আমি যে গোঁড়া বামুনের ছেলে। গলায় পৈতে না থাকলে মা এই বয়সেও কান ধরে টানেন।"

শুনে সরয়ূপ্রসাদ হেসে উঠল। তারপর বলল, "কিন্তু ভারী লাগে না?"

"মোটেই না। অদ্ভুত চাবি। দেখতে সরু লিকলিকে, ওজন নেই বললেই হয়, কিন্তু আশ্চর্য রকম মজবুত। কোন একটা বিশেষ অ্যালয় দিয়ে তৈরী মনে হয়।"

সরয়ূপ্রসাদ তারিফ করে বলল, "ব্যস্, এই সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা।" শুধু মুখে বলল না, সুশান্তর কাঁধে দু'টো চাপড় দিয়ে তাকে চাঙ্গা করে তুলবার চেষ্টা করল।

আরও খানিকক্ষণ নানা আলোচনার পর সরয়ূপ্রসাদ বলল; "আজ তবে উঠি, কেমন?"

আর একটু বস না, তোমার আবার কিসের তাড়া?"—বলল বটে কিন্তু তার মুখ দেখে মনে হ'ল সে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছে।

"কি হ'ল আবার?"

"না, কিছু না, পিঠটা বড় চুলকোচ্ছে। জামার ভেতর পোকাটোকা কিছু ঢুকেছে বোধ হয়" নাকি ডোরা পিঁপড়ে? বলতে বলতে সুশান্ত গায়ের জামাটা টেনে খুলে ফেলল। জামাটা টেবিলের ওপর রেখে খালি পায়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল "তুমি একটু বস, আমি বাথরুম থেকে পিঠটা একটু তোয়ালে দিয়ে ঘষে ধুয়ে আসি। বড্ড চুটমুট করছে।"

দু'মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল সুশান্ত, বলল, "পিঠটা চাকা চাকা হয়ে উঠেছে; এই অ্যান্টিসেপ্‌টিক মলমটা একটু পিঠে ঘষে দাও তো।"

"আরেঃ, তাই তো, এ যে ফুলে উঠেছে দেখছি। দাও দাও। এঃ, কি কাণ্ড।"

ওষুধ লাগাবার পর সুশান্ত যেন একটু আরাম বোধ করছিল। এবার আলগোছে জামাটা গায়ে দিতেই সরয়ূপ্রসাদও উঠে দাঁড়াল। "যাই, আমারও একটু কাজ আছে। ঘাবড়িও না ভায়া। সব ঠিক হয়ে যাবে। স্ট্রং-রুমটার কথা মনে রেখ কিন্তু।"

চার

অনেক রাত্তির পর্যন্ত ঘুম আসছিল না সুশান্তর। কিছুক্ষণ এ-বই ও-বই নড়াচাড়া করে শেষটায় ইজিচেয়ারটাতে গা এলিয়ে দিয়েছিল সে আর মাথার মধ্যে সুর সুর করছিল নানা দুশ্চিন্তা। শেষ রাতের দিকে একটু ঠাণ্ডা হাওয়া আসতেই কিন্তু চোখের পাতাটা আপনি বুজে এল।

কিন্তু খুব বেশিক্ষণ ঘুমোনো অদৃষ্টে ছিল না তার। তখনও ভালো করে ভোর হয় নি, সদর দরজায় কার হাঁকডাক শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল তার। বেরিয়ে এসে দেখে ব্যাঙ্কের দরোয়ান চৌবে অত্যন্ত বিচলিত মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়েছে বললে ভুল বলা হবে। ফটকের একটা দরজার ওপর হাত রেখে কোন মতে নিজেকে সামলে রেখেছে সে; নইলে যে ভাবে তার শরীর থর থর করে কাঁপছে তাতে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাও প্রায় অসম্ভব।

কাঁপতে কাঁপতে চৌবে জানাল কাল রাতে সর্বনাশ হয়ে গেছে। বুটি টুটি সেঁকে ঠিক সময়েই খাওয়াদাওয়া করে নিয়েছিল সে আর তার সঙ্গী পাহারাদার ছ জন। তারপর রোজ যেমন খায় তেমনি একটু সিদ্ধির সরবৎ খেয়ে নিয়ে ঢোলক নিয়ে একটু ভজন গাইছিল তিনজনে। এরই মধ্যে কখন কোথা দিয়ে 'ডাকু' ঢুকেছিল ব্যাঙ্কে তারা টেরও পায়নি। ডাকু শুধু ঢোকেই নি, কি করে স্ট্রংরুমের তালা ভেঙ্গে তাড়া তাড়া নোট বার করে নিয়ে ভেগে গেছে। ওরা ভোরের দিকে লোটা আনতে ঘরের ভিতর ঢুকতেই দেখে এই কাণ্ড। স্ট্রংরুম্ তছ্‌নছ। কাগজপত্রও সব এদিকে সেদিকে ছড়ানো। দেখে মনে হয় এক দঙ্গল ছিল দলে —এক আধজনের কাজ—এ নয়, আর কী নিঃশব্দে তারা কাজ হাসিল করে গেছে! নইলে পাহারাদার দু'জন তো বন্দুক হাতে সর্বক্ষণই দোর-পাহারা দিচ্ছিল,, সেও পাকানো লাঠি বগলে চেপে শুতে যাবে যাবে করছিল। আর এরই মধ্যে—!

শুনে সুশান্ত কয়েক মিনিট হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার পর মনে হ'ল মাথাটা কেমন ঘুরছে। ইশারায় দারোয়ানকে একটু দাঁড়াতে বলে সে ছুটে গেল ঘরের মধ্যে—

কোন রকমে দেয়াল ধরে ধরে, তার পর ধপ্ করে ঈজি-চেয়ারে শুয়ে পড়ল। মনে হ'ল মাথাই শুধু ঘুরছে না, বুকটাও কেমন ধড়ফড় করছে।

কতক্ষণ যে ঐ ভাবে পড়ে ছিল খেয়াল নেই, হঠাৎ দরজার কাছে 'হুজুর' এবং 'মানিজার সাহিব' ডাক শুনে সম্বিৎ ফিরে এল তার। দরোয়ান অপেক্ষা করে করে শেষে অধৈর্য হয়ে ছুটে এসেছে।

সুশান্তর। স্ট্রংরুমের তালা ভাঙ্গা তো সহজ কথা নয়! আজকাল অবশ্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে আগুনে গালিয়ে ফেলে এ সব কাণ্ড মাঝে মাঝে করা হচ্ছে। কিন্তু সে এদেশে নয়, ইয়োরোপ-আমেরিকার মত "সভ্য" দেশেই এসব ব্যাপার শুনতে পাওয়া যায়। তা হলে?

কিন্তু ব্যাঙ্কে পৌঁছে সে যা দেখল তাতে হতভম্ব হয়ে গেল। না, তালা ভাঙ্গা হয় নি, চাবি দিয়েই খোলা হয়েছে।

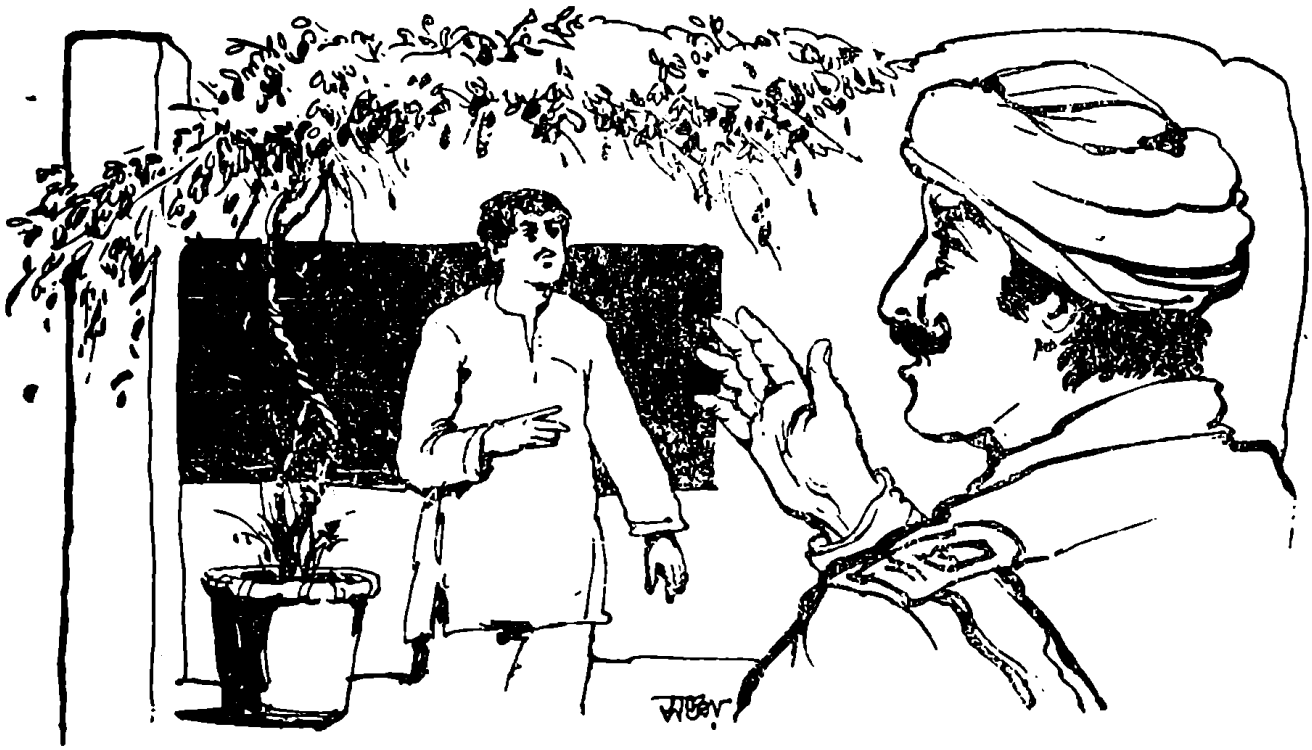

সুশান্ত আর দেরী করল না। পরনের পায়জামা আর বদলানো হ'ল না, কোন রকমে আলনা থেকে একটা বুশ্ শার্ট টেনে নিয়ে গায়ে কোন রকমে জড়িয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল দরোয়ানের সঙ্গে। এতো ভোরে তো আর রিক্সা টিক্সা পাওয়া যাবে না, তাই হেঁটেই চলল দু'জনে দ্রুত পায়ে।

নানা চিন্তা এরই মধ্যে মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছিল তালার গায়ে তখনও চাবি ঝুলছে। তা হলে ডাকাতরা ডুপ্লিকেট চাবি করেই একাজ করেছে। কিন্তু এসব অসম্ভব দামী তালার ডুপ্লিকেট চাবি কি সহজে করা যায়? যাই হোক, যারা করেছে নিঃশব্দেই করেছে। দরোয়ানরা তখন ঢোলক বাজিয়ে গানে মত্ত ছিল।

[ক্রমশঃ]

* * * * *

বিজ্ঞান সাহিত্যে পুরস্কার

এ বছরে বিজ্ঞান সাহিত্যে রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন ডঃ অনাদি নাথ দাঁ তাঁর রচিত 'ইলেকট্রনিকস্' গ্রন্থটির জন্য। গত ২৫শে বৈশাখ একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে এই পুরস্কার অর্পণ করা হয়। কিছুদিন আগে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত নরসিংহ দাস লাভ করেন ডঃ জয়ন্ত বসু তাঁর রচিত 'পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়' গ্রন্থটির জন্য।

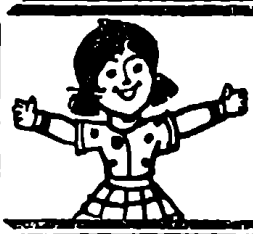

ছোটদের দপ্তর

পরিচালক : জয়ন্ত দত্ত

● তোমরা যারা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক এবং স্কুলে পড়াশোনা করছ—'ছোটদের দপ্তরে' লেখা পাঠাতে পার। সম্পাদকমণ্ডলীর মনোনয়ন পেলে সে লেখা 'ছোটদের দপ্তরে' ছাপা হবে। তবে শব্দ সংখ্যা কিছুতেই যেন ২০০-এর বেশী না হয়। সংগে প্রয়োজন মতো ফটো বা আঁকা ছবি পাঠাবে।

● শুধু আমাদের প্রশ্নই নয়, তোমরাও ছোটদের দপ্তরে প্রশ্ন পাঠাতে পার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রশ্ন, পড়াশোনার প্রশ্ন, যার উত্তর আমরা পরবর্তী সংখ্যাগুলিতে প্রকাশ করব।

'বিজ্ঞান জিজ্ঞাসার' প্রশ্নের উত্তর চলিত মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে আমাদের দপ্তরে পৌঁছানো চাই।

● প্রশ্নের সংগে তোমরা নিজেদের বয়স কিন্তু উল্লেখ করবে।

তবে সব ক্ষেত্রেই চিঠি বা খামের উপরে 'ছোটদের দপ্তর' কথাটি উল্লেখ করবে।

বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার মে'৮২ সংখ্যার দশ বা তার বেশী সঠিক উত্তরদাতাদের নাম

১। সুদীপ্তকুমার জানা – মেছেদা, মেদিনীপুর।
২। সৌমিত্র মজুমদার—৭৩, পূর্বাচল পল্লী, রহড়া, ২৪ পরগণা।
৩। সরিৎকুমার দাস– কুতুবপুর, মিস্ত্রীপাড়া, মালদা।
৪। কল্লোল মজুমদার—জুবিলী রোড, মালদা।
৫। সাবনা খনম—
৬। অভিজিৎ রায়—২৫/১, দয়াল ব্যানার্জী রোড, হাওড়া-২।
৭। মৃগাঙ্কমৌলি কর—১২৪, শহীদ গণেশ দত্ত রোড, বিরাটী, কলকাতা-৫১।
৮। সুরজিত পাল—৩৭, শশীভূষণ ঘোষ লেন, শ্রীরামপুর, হুগলী।
৯। শুভ্রা চন্দ্র—কালীতলা, প্রতাপপুর, হুগলী।
১০। পার্থ দাশগুপ্ত—রংপুর, বর্ধমান।
১১। পল্লব মোহান্ত—পলাশীপাড়া মহাত্মা গান্ধী স্মৃতি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যাপীঠ, নদীয়া।
১২। সুব্রত দত্ত—বৈঁচিগ্রাম, হুগলি।
১৩। মৌসুমী পাল—৫২৩, জি. টি. রোড, শ্রীরামপুর, হুগলী।
১৪। আশিস চ্যাটার্জী—কনকশালী বোসের ঘাট, চুঁচুড়া, হুগলী।
১৫। প্রদীপ মুখোপাধ্যায়—৭/১৭, মহিষকাপুর রোড, দুর্গাপুর, বর্ধমান।

গত সংখ্যার বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসার সমাধান

১। নীল। ২। অক্সিজেনের অভাবে। ৩। ক্যাল-সিয়াম কার্বনেট। ৪। প্রথম শ্রেণীর লিভার। ৫। অম্লরাজে। ৬। এনজাইম। ৭। ডারউইন। ৮। মন্থন। ৯। পিতা : উইলিয়াম ব্রাগ ; পুত্র : লরেন্স ব্রাগ। ১০। প্রায় পরিবাহী। ১১। 1000 কিলোগ্রাম। ১২। ওভারি। ১৩। ল্যাক্টোজ। ১৪। রঞ্জন। ১৫। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক।

প্রশ্নোত্তর

সেখ আসগার হোসেন
এস. ই. ই.—জে. সি. পলিটেকনিক।

প্রঃ সৌরশক্তি হইতে কিভাবে রান্না ও বাতি জ্বালানো যায় তাহা পত্রিকার মাধ্যমে জানাইবেন ও কিভাবে যন্ত্রটি তৈরি করা যায় ও কেমন ব্যয় হয় তাহা জানাইবেন।

উঃ সৌরশক্তি থেকে রান্না করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন তাপ। সুতরাং, তার জন্য শক্তিশালী লেন্স বা আয়নার সাহায্য নেওয়া দরকার—যা সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করবে এবং তাপ সৃষ্টি হবে। যেমন, লেন্স দিয়ে তোমরা হয়তো অনেকেই পাতলা কাগজ পুঁড়িয়েছ। সৌরশক্তি থেকে বাতি জ্বালাতে গেলে প্রথম বিভব প্রভেদ তৈরি করা দরকার। তার জন্য থার্মোকাপল বা ফটো ভোল্টেইক সেল (photo voltaic cell) ব্যবহার করতে হবে। তবে উৎপন্ন ভোল্টেজ খুব কম হয় বলে অনেকগুলো সেল বা কাপল্ ব্যবহার করা প্রয়োজন।

এই পদ্ধতিতে খরচ এখনও অনেক বেশি, তাই ঘরে ঘরে ব্যবহার করার উপযোগী করা যায়নি।

কাঞ্চনকুমার মুখোপাধ্যায়
দোয়াশা আদিগ্রাম বি. এস. ইউ. বিদ্যালয়, বর্ধমান।

প্রঃ আলোকশক্তিকে কি সরাসরি তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়? যদি যায়, তাহলে কিসের মাধ্যমে?

উঃ ফটো ভোল্টেইক সেল বা আলোক ভোল্টীয় কোষের সাহায্যে। এ ছাড়াও, আলোতে যদি তাপ থাকে, তাহলে থার্মোকাপ্‌ল (Thermocouple) ব্যবহার করা যেতে পারে।

শঙ্কর মিত্র
কালিকাপুর, ২৪ পরগণা।

প্রঃ H_2O_2কে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড বলা হয় কেন?

উঃ তুমি হয়তো জানো, H_2O হলো জলের রাসায়নিক নাম। একে হাইড্রোজেন অক্সাইড বলা হয়। H_2O_2 তে অক্সিজেন পরমাণু বেড়ে যাওয়াতে তার নাম হয়েছে হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড। 'পার' শব্দটির মধ্যেই 'অতি' বা 'বেশি' অর্থটির ইঙ্গিত রয়েছে।

বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা

অমরনাথ রায়

১। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের স্বাভাবিক উষ্ণতা সেলসিয়াস স্কেলে কতো?
২। ক্যারাট (Carat) মাপে বিশুদ্ধ সোনার মান কতো?
৩। ভারতের প্রথম পারমাণবিক চুল্লীর নাম কি?
৪। গোবর গ্যাসের প্রধান উপাদানটি কি?
৫। অ্যাসিড মাত্রেরই একটি সাধারণ মৌলিক উপাদান আছে। সেটির নাম কি?
৬। উদ্ভিদ দেহের কোন্ অংশে সালোক সংশ্লেষ ঘটে?
৭। লগারিদ্‌ম (Logarithm)-এর আবিষ্কর্তা কে?
৮। সুস্থ পূর্ণবয়স্ক মানুষের গড় হৃদস্পন্দন প্রতি মিনিটে কতো?
৯। স্টোরেজ ব্যাটারিতে কোন্ ধাতু ব্যবহৃত হয়?
১০। মানুষের দেহের রক্তের শ্রেণী বিভাগ করার জন্যে কোন্ বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান?
১১। যক্ষা রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন কোন্ বিজ্ঞানী?
১২। যন্ত্রচালিত বেলুন কে আবিষ্কার করেন ও কবে?
১৩। কোন মাছকে 'জীবন্ত জীবাশ্ম (Living fossil) বলা হয়?
১৪। ইলেক্ট্রোকার্ডিয়োগ্রাফ এর যন্ত্র আবিষ্কার করেন কে?
১৫। 'সন্ধ্যা তারা' কাকে বলা হয়?
১৬। সিডেরাইট (Siderite) কোন্ ধাতুর আকরিক?

[সমাধান পরবর্তী সংখ্যায় থাকবে।]

'ভেবে বলো'র উত্তর

১। গ্যালেয়েড, রমরিক, টিনয়েড্
২। জাহাজ ধ্বংস করবার বিস্ফোরক
৩। ফোনোগ্রাফী ৪। কাঠ বেড়ালী
৫। অ্যাট্রোপিন।
৬। ক) কক্কি [COCCI] খ) ব্যাসিলি [BACILLI]
গ) স্টাফিলো কক্কি [STAPHILO COCCI]
ঘ) স্পিরিলা [SPIRILIA]
৭। আলব্রিকো ৮। ১৬৪২ ৯। অর্মাডিলো
১০। ১০৬৩° ১১। ৪৫° ১২। বক পাখী

গদাইয়ের জীবনবিজ্ঞান

বরুণদেব ব্যানার্জ্জী

গদাই এবার IX-এ উঠল। ওর জীবনবিজ্ঞানের নম্বরটা ভালো হয়নি। মাত্র 40 পেয়েছে। তাই প্রথম থেকেই খুব ভালো করে জীবনবিজ্ঞান পড়তে লাগল। লেটার তাকে এবার পেতেই হবে। লেটার পাওয়ার জন্য সে পাড়ার একজন জীবনবিজ্ঞান বিশারদের পরামর্শও নিল আর তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে লাগল। দিনরাত শুধু জীবনবিজ্ঞান আর জীবনবিজ্ঞান। গদাই মনে করে শুধু পড়লেই হবে না, বাস্তব জীবনে তা কতটা কার্যকরী সেটাও জানতে হবে। তাই সে প্রথম থেকেই 10টি জীবনবিজ্ঞানের বই পড়তে লাগল।

একদিন ওর দুই ভাই দৌড় দৌড় খেলা করছে। তাই না দেখে গদাই তো রেগে আগুন। ওদের চুলের মুঠি ধরে বলল, "জানিস দৌড়ে 600 কিলো ক্যালরি শক্তি খরচ হয়। খবরদার, আর কোনদিন দৌড়াবি না।" ওর ভাই দুটো ওর কথা শুনে হাঁ করে তাকিয়ে আছে দেখে আবার বলে উঠল, "বড় হ। জীবনবিজ্ঞান পড়লে সব বুঝতে পারবি।"

আর একদিন হয়েছে কি, পাড়ার ছেলেরা সাঁতার কাটছে। তারা বলাবলি করছে, "দেখেছিস, গদাইটা যেন কিরকম হয়ে গিয়েছে। আগে সাঁতার কেটে ঘাট তোলপাড় করে তুলত আর এখন .."

এমন সময় গদাই ঘাটে উপস্থিত হল। তখন সাধু তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা গদাইদা, তুমি আর সাঁতরাও না কেন ?"

"—ওতে 630 কিলো ক্যালরি শক্তি খরচ হয়। শুধু শুধু শক্তি খরচ করে কি লাভ ? তোরাও যেন আর সাঁতার কাটিস না। আর আমার সামনে সাঁতার কাটলে তোদের সবাইকে মেরে তক্তা বানাব।" (বলাবাহুল্য গদাইয়ের গায়ে ছিল প্রচণ্ড জোর)। সেই দিন থেকে ছেলেদের সাঁতার কাটা বন্ধ হল।

গদাইয়ের ঠাকুমা বিধবা। রোজ সন্ধ্যায় ছানা না হলে তাঁর চলে না। একদিন গদাই তাঁকে বলল,

"—আচ্ছা ঠাকুমা, বিধবারা কোনদিন আমিষ খায় ?"

"—না, খায় না।"

"—তাহলে তুমি খাচ্ছ কেন ?"

"—কই না তো !"

"—এই যে ছানা খাচ্ছ, ওটা কি আমিষ নয় ?"

"—না, না, এটা তো আমিষ নয়।"

"—হ্যাঁ, ওটা আমিষ। জীবনবিজ্ঞানে ওটা আমিষ।"

এই ভাবে ভাইদের দৌড়াদৌড়ি, পাড়ার ছেলেদের সাঁতার কাটা, ঠাকুমার ছানা খাওয়া ইত্যাদি আরও কত কিছু বন্ধ হয়ে গেল। আর যাতে বন্ধ হয় তার জন্য সে গোয়েন্দাগিরিও চালাতে লাগল।

তার এই জীবনবিজ্ঞানের কথা মুখে মুখে রাষ্ট্র হয়ে গেল। মা, বাবা, ঠাকুমা, ঝি, চাকর থেকে আরম্ভ করে সবারি কাছে সে প্রিয় হয়ে উঠল। তবে পাড়ার ছেলেরা বলতে লাগল গদাই যদি 40-এর কম পায় তাহলে ওর কথা কেউ মানব না। এই কথা শুনে গদাই আরো ভালো করে পড়তে লাগল।

ক্রমে 'হাফ-ইয়ার্লি' পরীক্ষা এগিয়ে এল। আমাদের গদাই তৈরী। Result দেখার জন্য আমরাও তৈরী।

কিন্তু দুঃখের কথা, ও এবার লেটার তো পেলই না বরং 40 এরও কম পেল, মাত্র 20। হায় ! ওকে আর কি পাড়ার ছেলেরা মান্য করবে !

গ্রাম+পোঃ—মাটিয়ারী, জেলা—নদীয়া

সংখ্যাকূট : সঞ্জয় রায়

এপ্রিল সংখ্যার সমাধান

১	৯	০	৯			২
৮			৯		১	৮
৩			২	২	২	
১	৯	১	৬		০	
		৫		১	০	৬
১	৯	৩	৭			৫
		৫		৬	২	৭

ভেবে ভেবে বল

শুভব্রত রায়চৌধুরী

১) সাধারণত মাছের আঁশ তিন রকমের হয়, এদের নাম বলো।

২) টরপিডো কি?

৩) শব্দলিখন এবং শব্দ পুনরায় উৎপাদন যন্ত্রটির নাম বলো।

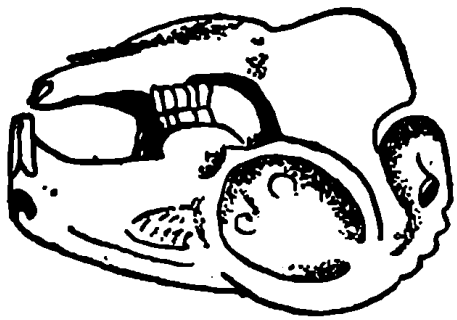

৪) উপরের ছবিটি একটি প্রাণীর মাথার কঙ্কাল। প্রাণীটির নাম বলো।

৫) চক্ষু চিকিৎসকগণ চক্ষুর তারা বিস্তৃতির জন্য এক প্রকার ঔষুধ ব্যবহার করেন—এর নাম বলো।

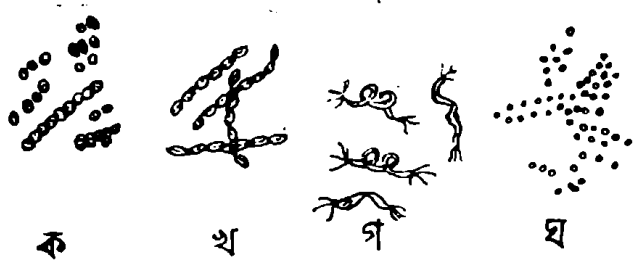

ক খ গ ঘ

৬) উপরের ছবিতে [ক--ঘ] চারটি রোগ জীবাণু দেখান হয়েছে, এদের নাম ভেবে বলো।

৭) লেবু জাতীয় ফলের খোসার ভেতরের সাদা অংশটি এক জাতীয় পেকটিন নামক পদার্থ দিয়ে সমৃদ্ধ। এর নাম বলো।

৮) ১৯০৫, ১৬৪২, ১৭৬৬ এই সালগুলির মধ্যে কোন্ সালে স্যার আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন - ভেবে বলো।

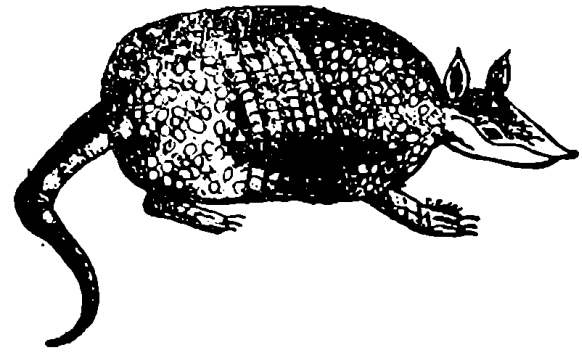

৯) উপরের ছবির জন্তুটির নাম বলো।

১০) সোনার গলনাঙ্ক তাপমাত্রা ১১৫২, ১০৬৩, ১৬০ কোন্‌টি ঠিক ভেবে বলো।

১১) 'ক' চিত্রটিকে কতো ডিগ্রী ঘোরালে (খ) চিত্রটির আকার নেবে।

ক খ

১২) কোন্ পাখীরা সব থেকে বড়ো ডিম পাড়ে?

উঃ ৫০ পাতায়

১০৪, ডায়মণ্ড হারবার রোড
কলিকাতা-৭০০০০৮

শব্দকূট ঃ স্বাতী রায় ॥ মে' সংখ্যার সমাধান

১ক্যা	ল	২সি	য়া	৪ম
লো	■	স	■	য়ূ
রি	৭আ	৩মো	ট	র
৬কি	লো	গ্রা	ম	■
■	ক	৫ফ	সি	ল

লেসার রহস্য

কৌশিক লাহিড়ী

"লেখার রশ্মি" নামটা আমরা শুনেছি। সবাই হয়ত শুনিনি। কিন্তু যারা শুনেছি তাদেরও এই রশ্মি সম্বন্ধে হয়ত কোনো স্পষ্ট ধ'রণা নেই।

'Laser' কথাটা কতগুলো শব্দের সমষ্টি। পুরো কথাটা হ'ল -'Light amplification stimulated emission of radiation.'

তাই বলা যেতে পারে 'লেসার' আলোকে 'অ্যাম্প্লিফাই' বা বিবর্ধিত করে। দুর্বল বা নিস্তেজ আলোকরশ্মিকে 'লেসার' তীব্র জোরালো একটি রশ্মিতে পরিণত করতে পারে সহজেই। এই রশ্মিটি এত তীব্র হয় যে শক্ত ইস্পাতের গায়ে এক সেকেণ্ড-এরও কম সময়ে এটি ছিদ্র সৃষ্টি করতে পারে। অথবা যদি একে কোনো ধাতুর ওপর 'ফোকাস' করা হয়, তবে নিমেষের মধ্যে ধাতুটি বাষ্পীভূত হ'তে পারে।

লেসার রশ্মি মহাশূন্যের (space) মধ্যে এতটুকুও তীব্রতা না হারিয়ে বা না ছড়িয়ে পরে যেতে দূরে বহুদূরে। বৈজ্ঞানিকগণ তাই আশা করেছেন যে 'লেসার এই স্পেস এজে' (space age) যোগাযোগের কাজে অপরিহার্য হয়ে উঠবে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে, প্রযুক্তিবিদ্যায়, শিল্পে-বাণিজ্যে 'লেসার রশ্মি'র উপযোগিতা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে।

'লেসার রশ্মি' কি করতে পারে ; তার উপযোগিতা কি এ সম্বন্ধে তো জানা গেল। এবার জানা যাক 'লেসার রশ্মি' জিনিসটা কি।

বৈজ্ঞানিকগণ আলোকে তরঙ্গরূপে অভিহিত করে থাকেন। আলোর একটি তরঙ্গের একটি 'crest' বা 'শিখা' থেকে অপর 'শিখা'র দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wave length) বলে। সূর্য বা কোনো মোমবাতি বা যে কোনো উৎস থেকে প্রাপ্ত আলো কতগুলি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মিশ্রণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে একটা কথা জানা উচিত যে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন রঙ সৃষ্টি করতে পারে।

একটি 'লেসার রশ্মি' এমন কতগুলি রশ্মির সমষ্টি যে তাদের প্রত্যেকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হুবহু এক। সাধারণ আলোর রশ্মিগুলি প্রত্যেকে আলাদা আলাদা গতিপথ অবলম্বন করে। যেমন, দেওয়ালে সূর্যের আলো পড়লে দেখা যায় যে তা বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে পড়েছে। কিন্তু 'লেসার রশ্মি'কে যদি দেওয়ালের উপর ফেলা সম্ভব হ'ত, তবে দেখা যেত যে সেটি তীব্র ভাবে একটি মাত্র বিন্দুতে আপতিত হয়েছে। তার কারণ লেসার রশ্মিগুলি একদম এক গতিপথে যায়।

লেসার রশ্মির তীব্রতা থেকে একথাও বোঝা যায় যে কোন কিছু ধ্বংস করতেও এর জুড়ি নেই। মারণাস্ত্র হিসেবে এটি ব্যবহৃত হলে তার ফল হবে মারাত্মক।

ফিরে আসা যাক লেসার রশ্মির গঠনের দিকে। বলা যেতে পারে, লেসারে তার রশ্মিগুলি একই সূত্রে গাঁথা। ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম : আলোর তরঙ্গের একটি 'শিখা' অপর 'শিখার' সংগে একই সরলরেখায় অবস্থিত বা আবদ্ধ। তাই 'লেসার রশ্মি' অত তীব্র। এই ব্যাপারটা সেই ঈশপের গল্পটা মনে করিয়ে দেয়। বৃদ্ধ কৃষক আর তার ছেলেদের গল্প। সব ছেলে যদি একসঙ্গে কাজ ক'রে তাহলে কাজটি খুব সুসম্পন্ন হয়। তাই নয় কি ?

ফ্রেজার অ্যাভিনিউ, বর্ধমান।

'নিজে কর' মজার পুতুল

● রাজীব মুখোপাধ্যায়

আমরা জানি চুম্বক সমমেরুকে বিকর্ষণ করে। অর্থাৎ কোনও একটি চুম্বকের উত্তর মেরুর সমানে অন্য একটি চুম্বকের উত্তর মেরু আনলে চুম্বক দুটি পরস্পরকে বিকর্ষণ করে। আমি যে মজার জিনিসটা বানাতে শেখাচ্ছি তাতে এই ধর্মটা ব্যবহার করেছি।

জিনিসটা বানাতে হলে চাই প্লাস্টিকের বা কাপড়ের তৈরী একটা পুতুল, দুটো চুম্বক একটা আয়না।

তোমার পুতুল হবে অদ্ভুত। সে কখনই সাজতে চায় না। আমাদের অনেকেই সাজগোজ করতে ভালোবাসি, সাজতে হলে আমরা আয়নার সামনে যাই। কিন্তু তোমার পুতুলকে যতই আয়নার সামনে আনবে ততই সে মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

আসলে কি করতে হবে জান? প্রথমে তোমার আয়নাটায় একটা চুম্বক লাগাবে। চুম্বকটা এমন ভাবে লাগাবে যে আয়নার সামনের দিকে যেন উত্তর মেরু থাকে। এবার পুতুলটার ভিতরে অন্য চুম্বকটা লুকিয়ে রাখতে হবে। এবং এমন ভাবে রাখতে হবে যে পুতুলটার মুখের দিকে যেন উত্তর মেরু থাকে।

এইবার পুতুলটাকে আয়নার কাছে নিয়ে গেলেই দেখা যাবে সে ঘুরে যাচ্ছে। আয়নায় লাগান চুম্বকের উত্তর মেরু ও পুতুলে লাগান চুম্বকের উত্তর মেরুর বিকর্ষণের ফলেই এটা হচ্ছে।

বালিগঞ্জ রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র

বৈদ্যুতিক পিয়ানোর গঠন

রাজেশ চ্যাটার্জ্জী

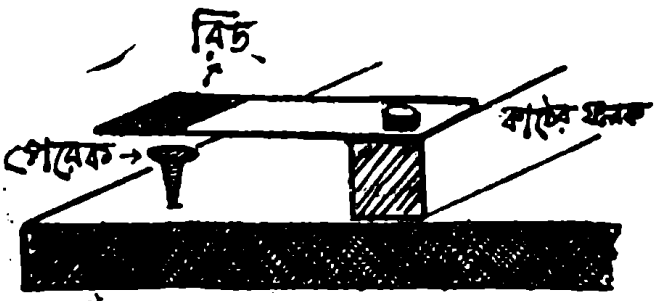

দিল্লী থেকে মিতুন এসেছে মামার বাড়ী কলকাতায় গরমের ছুটি কাটাতে। কলকাতার বন্ধু ভোলা ও মিঠুন গেছে বিড়লা ইনডাস্ট্রিয়াল ও টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়ম দেখতে। ওখানে গিয়ে বৈদ্যুতিক হারমোনিয়ামটা দেখে মিতুনের খুব নিয়ে আসার ইচ্ছে। বড় ভাল লেগেছে তার। তখন ভোলা বলল, রাজাদা তো এরকম অনেক কিছু করে, ওকে একবার বলে দেখলে পারিস। তখন তারা রাজাদার কাছে গেল, ও সুন্দর একটা হারমোনিয়াম করে দিল। তোমরাও তোমাদের ভাই বা বোনকে এরকম করে দিতে পার। করাটা এমন কিছুই নয়।

কি কি লাগবে—(1) ট্রানজিস্টার 2N213—১টা

(2) রেজিস্ট্যান্স 470 ওহম, $\frac{1}{2}$ ওয়াট ১টা

(3) ভেরিয়েবল্ রেজিস্ট্যান্স 100 কিলোওহম ১টা

(4) কন্ডেন্সার C_1 0·04 C_2 থেকে C_8 এর মান —0 0. মাইক্রোফারাড (MFD)

(5) সেন্টারট্যাপ্‌ড্ ট্রান্সফরমার T_1 Staneor4—3856—১টা

(6) ট্যাগ —4 way—১টা

(7) সুইচ—SPST—১টা

(8) স্পিকার 3 থেকে 5 ওহ্‌ম, পাঁচ-ছ ইঞ্চি ব্যাসের ১টা

(9) ব্যাটারী—1·5v এর চারটি

(10) ১ ফুট লম্বা, 6 ইঞ্চি চওড়া, উচ্চতা $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি একটি কাঠের তক্তা

(11) ১ ফুট লম্বা, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি চওড়া, $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি উচ্চতা যুক্ত একটা কাঠের ফলক।

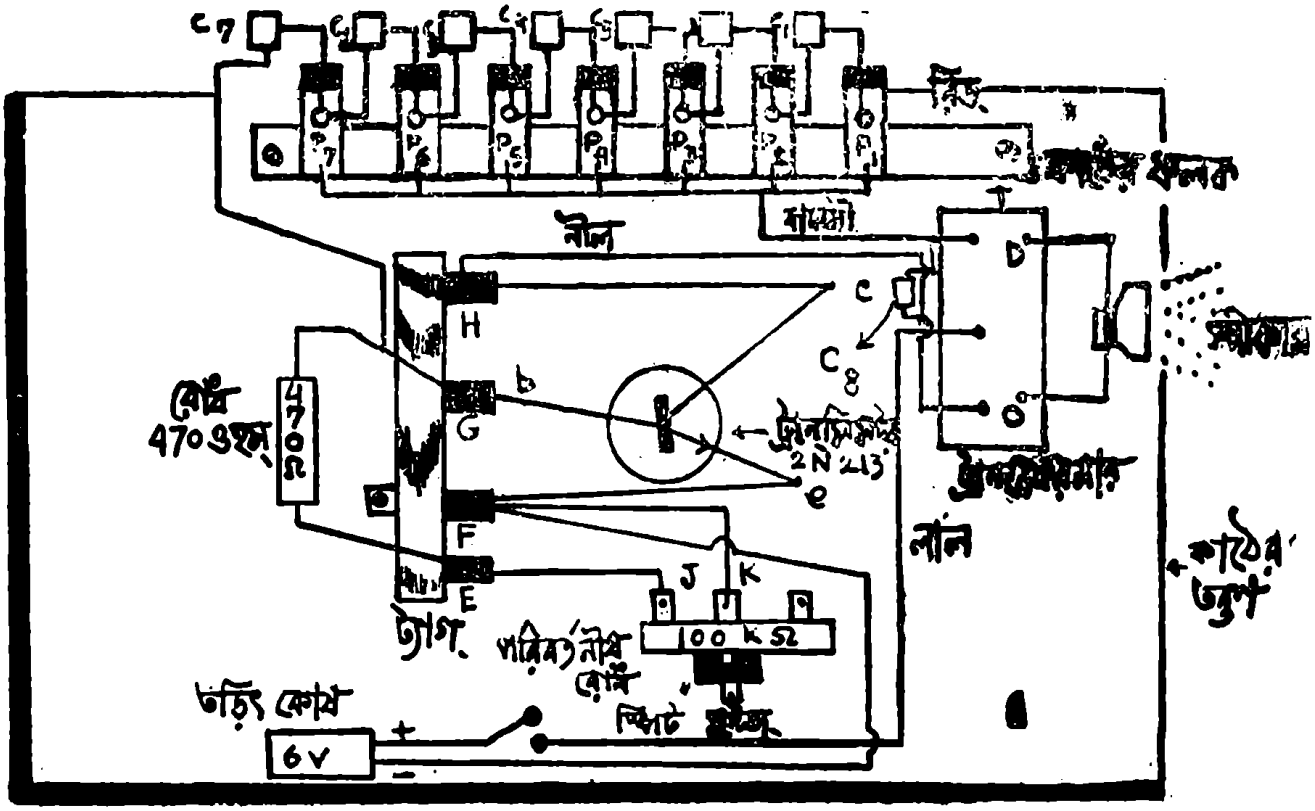

প্রথমে কাঠের তক্তার একপাশে ট্রান্সফরমার এবং এর কাছে ট্যাগটি স্ক্রু-এর সাহায্যে লাগাও। এখন ট্রান্সফরমার এর O ও D-প্রান্তের সঙ্গে স্পীকারটি যুক্ত কর। ট্রান্সফরমার এর অপর পার্শ্বে (যে দিকে তিনটি মুখ থাকে) তিনটি মুখে লাল, নীল ও খয়েরী রঙ লাগানো থাকে।

এখন C_8 কনডেন্সারের দুই প্রান্ত ট্রান্সফরমারের নীল ও খয়েরী প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কর। লাল রঙের চিহ্নিত প্রান্তের সঙ্গে SPST সুইচের এক প্রান্ত যুক্ত করে সুইচটির অপর প্রান্ত ব্যাটারীর পজিটিভ প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কর।

এখন ট্যাগের F, G এবং H প্রান্তের সঙ্গে যথাক্রমে ট্রানজিস্টারের এমিটার (a) বেস (b) ও কালেক্টর (c) প্রান্তযুক্ত কর। 470ওহম্ এর রেজিস্ট্যান্সের দুইটি প্রান্ত ট্যাগের E ও G প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কর। F প্রান্ত থেকে একটা তার ব্যাটারীর নেগেটিভ প্রান্তে ও আর একটি তার ভেরিয়েবল্ রেজিস্ট্যান্সের K প্রান্তের সঙ্গে যুক্ত কর। এরপর ট্যাগ-এর E ও ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের প্রান্ত যোগ কর। ট্রান্সফরমারের নীল প্রান্ত ও ট্যাগের H প্রান্ত যুক্ত কর।

এরপর ঐ কাঠের তক্তার ওপর কাঠের ফ্রেমটি লম্বা লম্বি ভাবে বসাও পেরেকের দ্বারা। সাতটা টিনের টুকরো (হারমোনিয়ামের রিডের মত করে কাটা রিডগুলো যেন $\frac{1}{8}$" বেশী চওড়া না হয়) ঐ ফলকটির উপর সমান দূরে পেরেক দিয়ে লাগাও। এমন প্রত্যেকটি রিডের তলায় তক্তার ওপর একটি করে পেরেক (P_1, P_2, P_3 ইত্যাদি) এমন ভাবে পোঁতা আছে যাতে রিড না টিপলে পেরেক ও রিডের মধ্যে কোন সংযোগ না হয়।

এবার রিডগুলো তার দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত কর। যে কোন একটির সঙ্গে ট্রান্সফরমার খয়েরী প্রান্ত জুড়ে দাও। এর পর C_1 কনডেন্সার এর দুই প্রান্ত P_2 ও P_3 পেরেকের সঙ্গে C_2 কনডেন্সারের দুই প্রান্ত P_2 ও P_3 পেরেকের সঙ্গে যুক্ত কর। ঠিক এই ভাবে C_3, C_4, C_5 ও C_6 পেরেকের সঙ্গে যুক্ত কর। রিডের যন্ত্রটি এবার বাজাবার জন্য সুইচ অন করে ভেরিয়েবল রেজিস্ট্যান্সের চাবিটি ঘুরিয়ে তোমার প্রয়োজনীয় স্কেলে রাখ।

এখন রিড টিপলেই স্পিকার দিয়ে সুন্দর শব্দ বেরোবে। যন্ত্রটি বন্ধ করতে হলে সুইচ অফ করে দাও।

খামারগাছি, হুগলী।

অনিল কর্মকার

কাণ্ড তো নয় চাট্টিখানি—ভাগনে বললো আমাকে,
রাত্তিরেতে কামড়ে ছিল বিলেত ফেরত মামাকে।
কোন্ জানোয়ার—জানিস না ?
কিছু তো তুই মানিস না,
দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে ছিল মত্ত মশক বাহিনী,
আজগুবি নয় সত্যি কথা, গা-ছমছম কাহিনী।
মামা হাঁকলেন—বাবারে,
হাজার খানেক থাবারে,
সাত জন্মেও দেখেননি তো এমন আজব শত্রুর,
কামান দেগেও হার হয়েছে—ইতিহাসের দপ্তর।
মামা বললেন—আজকে
দেখব অমন রাজকে
দ্বিতীয় বার কামড় বসায় কোন্ সে ব্রহ্মদত্যি,
ঘরের মধ্যে লটকে দিলেন নোটিশ সে এক রত্তি।
পড়লো ভাগনে চটপট,
'হিং টিং ছট ফট ফট,
অশ্বমেধের মতন হবে মশকনিধন যজ্ঞ,
আসুন যত মশক আছেন প্রাজ্ঞ এবং অজ্ঞ,
সকলকারই নেমন্তন্ন
হোক শহুরে কিংবা বন্য।'
ভাগনে বললো—বিষম কাণ্ড, ভাগলবা সব মশক,
এক নোটিশেই চমকে গেল উনিশ-আশীর দশক,
আসলে এক কল ছিল,
সন্ধ্যা হতেই চলছিল,
সামনে নোটিশ আড়ালে তার মামার নিপুণ রঙ্গ,
বল তো কী তা-আসল মন্ত্র—শব্দোত্তর তরঙ্গ।

হারুলের বিজ্ঞান-ভাবনা

ধীরেন বল

জুলে ভার্নে-র টোয়েন্টি থাউজেণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী : লেখা ও ছবি গৌতম কর্মকার

নেড-এর কথাগুলোয় যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল প্রফেসরের মাথায়। তখুনি তিনি দেখলেন, যেখানে রয়েছেন তার পুরোটাই লোহার চাদরে ঢাকা।

সর্বনাশ, যে প্রাণীটি সমস্ত শিক্ষিত সমাজে আলোড়ন তুলেছে, সেটি আদৌ কোন প্রাকৃতিক জীব নয়, মানুষের তৈরী ডুবোজাহাজ!

হঠাৎ জাহাজটা ডুবতে শুরু করল। উন্মত্ত নেড দমাদ্দম লাথি চালাল ওটার পিঠে।

দরজা খোল্ শয়তানের দল!

দুম্ দুম্

লাথির চোটে ডোবা বন্ধ হল। কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত। জাহাজটার পিঠের উপর একটা ঢাকনা খুলে গেল। সেখান থেকে আট জন মুখোশ-পরা লোক বেরিয়ে এসে বন্দী করল তিনজনকে।

একটা অন্ধকার ঘরে ওদের বন্দী রেখে লোকগুলো চলে গেল।

শয়তানের দল, কী ভেবেছে এরা আমাদের! ছোরাটা এখনো হাতছাড়া হয়নি, একবার বাগে পেলে--

ধৈর্য হারিয়ো না নেড, শান্ত হও!

বন্ধ দরজাটা খুলে গেল। আমুদ্রিক উদ্ভিদের টুপি পরা দুটি লোক উঁকি দিল ভিতরে।

R/ No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 2nd year • June 1982 Regd No WBCC/50

উপহার ও পাঠাগারের বই

কিশোর ক্ল্যাসিক্স

অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর
- ভেপান্তর ১৫-০০

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- ছোটদের কাশীনাথ ৬-০০

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- কিশোর অপু ১৫-০০
- অপুর ছেলেবেলা ৬-০০
- ছোটদের অপরাজিত ৬-০০

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের কাজল ৬-০০

বুদ্ধদেব বসু
- অপরূপ রূপকথা ১০-০০

পশুপাখী-বনজঙ্গলের গল্প

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- বনেজঙ্গলে ১৫-০০
- পশুপক্ষী, ১৫-০০

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
- পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ১০-০০

কেনেথ অ্যাণ্ডারসন
- বাঘের গর্জন ১৫-০০

ছবি ও ছড়া

যোগীন্দ্রনাথ সরকার
- খুকুমনির ছড়া ১০-০০
- রাঙা ছবি ৩-৩০

অন্নদাশঙ্কর রায়
- হট্টমালার দেশে ৫-০০

ঘনাদা ও টেনিদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র
- ঘনাদার জুড়ি নেই ৫-০০
- মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা ৫-০০
- ঘনাদা বিচিত্রা ১২-০০

নারায়ন গঙ্গোপাধ্যায়
- টেনিদার অভিযান ১৫-০০
- চারমূর্তি ৫-০০
- ঝাউবাংলোর রহস্য ৫-০০
- কম্বল নিরুদ্দেশ ৫-০০

বিজ্ঞান, বিজ্ঞানী ও কল্পবিজ্ঞান

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি প্রণীত
- বিশ্বের বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ১০-০০
- মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন ৮-০০
- আচার্য জগদীশচন্দ্র ৪-০০
- বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ৪-০০
- পরমাণুবিজ্ঞানী ভাবা ৪-০০

সমরজিৎ কর
- নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী ১০-০০

সাধন দাশগুপ্ত
- আলো আরও আলো ১৫-০০
- রোমাঞ্চকর রসায়ন ১২-০০

অমরনাথ রায়
- সংখ্যা নিয়ে খেলা ৫-০০
- জ্ঞান-বিজ্ঞানের মজার খেলা ৫-০০

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
- মেঘনাদ ৮-০০ লুপ্তধন ৮-০০

বাঙালী রবিনহুডের কাহিনী

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
- বাঙলার ডাকাত
  চারখণ্ডে প্রকাশিত। প্রতি খণ্ড ৬-০০
- মহিম ডাকাত ১০-০০

ফ্যান্টাসী, রহস্য ও অভিযান

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- সুন্দরবনে সাত বৎসর ৫-০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
- হাতিচোর ৬-০০

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- ছোটদের সন্দীপন পাঠশালা ১০-০০
- রামধনু ৬-০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
- কায়াহীনের কবলে ৪-০০
- হট যাও হার্মাদ ৫-০০

ধীরেন্দ্রনাথ ধর
- দুরন্ত যাত্রী ৫-০০

কোনান ডয়েল
- শার্লক হোমসের কিশোর গোয়েন্দা গল্প ৭-০০
- শার্লক হোমসের কিশোর রহস্য গল্প ৭-০০

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ • ৮/১সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বসু কর্তৃক ৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭৩ হইতে প্রকাশিত এবং ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা ৬, তাপসী প্রিন্টার্স হইতে মুদ্রিত। দাম দুই টাকা পঞ্চাশ পঁয়সা।

প্রচ্ছদমুদ্রন : রূপসা এণ্টারপ্রাইজ, ২০০ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলকাতা ১২